

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

সিস্টার মিখা এল. গবেজ, সিএসসি
ফাদার জনল টেরেন্স ডি'কস্তা, সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গনসালভেস, সিএসসি
রবার্ট টমাস কস্তা

সম্পাদনা

ফাদার আদম এস পেরেরা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
ফেরিয়াল আজাদ

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাহার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
ব্রাদার শ্যামল জেমস গোমেজ সি এসসি

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিকা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সুফির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিকারীর অভিনির্ভর মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিকারীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিকারীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনকল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিকারীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-পোষ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিকারীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিকারীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক গুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিকারীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনকল যুক্ত করে শিকারীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ঐতিহ্য ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিকারীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাবলম্বন ও ঈশ্বর কর্তৃক আহূত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও জীবনচরিত্র সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে রচনা করা হয়েছে। পরিত্রাভা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা ও তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনা উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে অত্র পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানাননীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে – যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রদান প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিকারীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট	১-৭
দ্বিতীয়	ঈশ্বরের সৃষ্টি উদ্ভব	৮-১৪
তৃতীয়	দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ	১৫-২৪
চতুর্থ	পাপ	২৫-৩৩
পঞ্চম	মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজ	৩৪-৪১
ষষ্ঠ	ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়া দান	৪২-৪৯
সপ্তম	যীশুর আচর্য কাজ ও ঐশ্বর্য	৫০-৫৬
অষ্টম	খ্রিষ্টমন্ডলী এক, পবিত্র ও প্রেরিতিক	৫৭-৬৩
নবম	কমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম	৬৪-৭৩
দশম	ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং	৭৪-৮২

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট

পিতা ঈশ্বর অগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ অগতে প্রেরণ করেছেন। পিতার ইচ্ছা হলো পুত্র ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা। যীশুই হলেন পিতার অতিবিশ্ব জন, মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট এবং সকল জাতির সকল মানুষের প্রভু। তাঁর মধ্য দিয়ে মানবজাতি পরিচোধ লাভ করেছে এবং পেয়েছে শান্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর আবার প্রকৃত মানব। আমরা তাঁরই সম্পর্কে এই অধ্যায়ে জানতে চেষ্টা করব।



ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিষ্ট

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্রের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- ঈশ্বরের পুত্র 'যীশু' নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্রের উপাধি 'খ্রিষ্ট'— এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্রের উপাধি 'প্রভু'—র অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ঈশ্বরপুত্র প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব, তা বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুকে নিজের প্রভু বলে গ্রহণ করব ও প্রভুর পথে চলতে অনুপ্রাণিত হবো।

পাঠ ১: ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্র যীশু খ্রিষ্ট

পূর্বের প্রেণিতে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জেনেছি। জগৎ সৃষ্টি ও মানবজাতির কল্যাণে তাঁর কর্মকীর্তি আমরা বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সৃষ্টির প্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্য তাঁর মুক্তিপরিকল্পনার কথাও আমরা অবগত হয়েছি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁর প্রতি অনুগত থাকি, তাঁকে ভালোবাসি ও তাঁর গুণকীর্তন করি। তিনিই প্রথম আমাদের ভালোবেসেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে আমরা আরও দেখেছি যে, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন: কখনো পিতারূপে, কখনো পুত্ররূপে, আবার কখনো পবিত্র আত্মারূপে। তিনি একসাথে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেননি। তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার যোগ্যতা মানবজাতির নেই। তাঁর মহানুভবতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দয়ালু ঈশ্বর তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা কখনো ভুলে যাননি। তিনি আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের কাছে সেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। সময় হলে পর তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন।

মানবজাতি বারে বারে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। তারা ঈশ্বরের অবখ্যা হয়েছে। তাই তাইকে খুন করে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস হয়েছে। এভাবে তাদের পতন হয়েছে। মহান ঈশ্বর মানুষকে পাশ থেকে উদ্ধার করতে এবং তাঁর কাছে মানুষকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে একটি মহাপরিকল্পনা করেছেন। তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন যে, তিনি মানুষের কাছে আসবেন। তাই ঠিক করেছেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে একটি নারীর মধ্য দিয়ে জগতে প্রেরণ করবেন।

রোম সাম্রাজ্যের সেন্টা অগাস্টাস সিজারের সময়ে এবং যুসোয়া সেপের রাজা হেরোদের শাসন আমলে কেবলহেমের একটি কুমারীর কাছে তিনি তাঁর দূতকে প্রেরণ করলেন। স্বর্ণদূত গভিরেয় মারীয়ার কাছে এসে ঈশ্বরের বার্তা প্রকাশ করলেন। মারীয়াকে প্রসাদে পূর্ণা বলে তিনি অবহিত করলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি মারীয়াকে জানানেন যে, ঈশ্বর তাঁর সহায় আছেন। তিনি গর্ভবতী হবেন এবং একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন। তাঁর নাম হবে যীশু। তিনিই হবেন সমগ্র মানবজাতির মুক্তিদাতা।

মারীয়া একজন সহজ সরল বুঝী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম যোয়াকিম এবং মায়ের নাম আন্না। তিনি যোসেফ নামে এক বুকের সাথে বাগদত্তা হয়েছিলেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে মারীয়ার পরিবার ছোট একটি গ্রামে বাস করতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জীবনযাপন চলছিল। মারীয়ার পিতামাতা ধার্মিক এবং ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন। পিতামাতার ত্রেহালাবাসায়া ও বড়ো মারীয়া বড় হন। পিতামাতার ন্যায় মারীয়াও খুব ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। ঈশ্বর আগে থেকেই মারীয়াকে মনোনীত করে রেখেছিলেন তাঁর পুত্রের জননী হওয়ার জন্য। তাই তিনি মারীয়াকে জনৈর আগে থেকেই আলাদা করে রেখেছিলেন, যেন আদিপাপ তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। মারীয়া ছিলেন নিরুদলভা ও আদিপাপ বর্জিত। গভিরেয় দূতের সম্বোধনে মারীয়া কিশিগত হলেন। দূতের বার্তা শুনেই সেভাবে তিনি দূতকে প্রস্তুত করলেন, এ কী করে সম্ভব, কারণ তিনি যে কুমারী। দূত বলেন, ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কাজেই পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়া গর্ভবতী হবেন। কারণ ঈশ্বরই হবেন তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবেন। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের কারণে মারীয়া “হ্যাঁ” বলেছেন। আর এই “হ্যাঁ” বলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

মারীয়ার স্বামী যোসেফ একজন ধার্মিক, ঈশ্বরভীরু ও কিনয়ী মানুষ ছিলেন। সেলায় তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি। তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই মারীয়া গর্ভবতী হলেন। এই সবোদ জনার পর তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গভিরেয় দূতকে যোসেফের কাছে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা তাঁকে জানানো। যোসেফকে তিনি সাহস দিলেন যেন মারীয়াকে তিনি সন্নিহিত গ্রহণ করতে ভয় না পান। কারণ মারীয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভবতী হয়েছেন। আর তাঁর যে সন্তান হবে তা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

গাব্রিয়েল দুতের কথা মতো বোসেফ সবকিছু করলেন। তিনি মারীয়াকে নিজের স্ত্রী ও যীশুকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলেন। এভাবে মারীয়া ও বোসেফের পরিবারে ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তিনি শাবুত ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্র, প্রভু যীশু খ্রিষ্ট। “আগনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র” (মথি ১৬:১৬)–সামু পিতরের মতো করে এই কথা বলে আমরা সবাই যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। কারণ তাঁর আলমনে সমগ্র মানবজাতি পেয়েছে অনুগ্রহ আর পরিদ্রাণ।

কাজ : মারীয়ার যে কোন ঐতিহাসিক গল্প দেখ।

পাঠ ২: ‘যীশু’ নামের অর্থ

আমাদের প্রত্যেকের এক বা একাধিক নাম আছে। প্রতিটি নাম খুব সুন্দর। আমরা এই নামেই অন্যের কাছে পরিচিত। সাধারণত বাক্তি বা নামকরণ অনুষ্ঠানের সময় আমাদের নামকরণ করা হয়। একেক জনের নামে আমরা অনেক আক্ষরিক অর্থ কিংবা সমার্থক শব্দ বুঝে পাই। আবার অনেক নামের কিছু ঐতিহাসিক কিংবা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। এসব নামের ব্যাখ্যা করলে অনেক তাৎপর্য বুঝে পাওয়া যায়।

পবিত্র বাইবেলে এমন অনেক নাম আছে যেনুশের সাথে কোনো ঘটনা বা ঈশ্বরের কোনো বিশেষ পরিকল্পনার সাথে মিল পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ‘মোশী’ নামের অর্থ হলো জল থেকে টেনে তোলা। এই নাম ও এর অর্থ শুনলে সাথে সাথে আমাদের পবিত্র বাইবেলের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল জাতি মিশরে ফারাও রাজ্যের অধীনে দাসত্ব করেছিল। ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশররাজ ভয় পেয়েছিলেন। তাই রাজ্যের আদেশে ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত পুরুষ-সন্তানদের হত্যা করা হতো। মোশী ইস্রায়েল-সন্তান ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন যেন সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করতে না পারে। পরে ফারাও-কন্যা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীর নলখাপড়ার অভায়ে একটি শিশুর কান্না শুনতে পান। শিশুটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁকে তিনি জল থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আর নাম দিয়েছিলেন মোশী। কারণ তাঁকে জল থেকে তুলে আনা হয়েছিল। এই মোশীই পরে তাঁর জাতিকে ফারাও রাজ্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। যাকে জল থেকে টেনে তোলা হয়েছিল তিনি তাঁর জাতিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

মোশীর দ্বারা ফারাও/ফৌরান রাজ্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও ঈশ্বরের মনোনীত জাতি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ঈশ্বর বিভিন্ন রাজা, বিচারক, যাজক, প্রতীক ও প্রবক্তাদের দ্বারা তাঁর মনোনীত জাতিকে পঠন ও পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। অকৃতজ্ঞ মানুষেরা ঈশ্বরকে তুলে দিয়েছিল। তারা বারবার ঈশ্বরের বিদ্বেষ পাপ করেছিল। সমগ্র মানবজাতিকে পাপের কালিমা থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর তাই নিজেই এসেছেন মানুষের সাথে বাস করতে, মানুষকে পথ দেখাতে ও স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে।

মারীয়ার গর্ভে তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণের সময় ঈশ্বর একটি নাম দিয়েছিলেন। গাব্রিয়েল দুত মারীয়াকে বলেছিলেন, এই যে সন্তান, এর নাম হবে ‘যীশু’। এই নামের অর্থ হলো ‘ঈশ্বর উদ্ধার করেন’। এই নামেই ঈশ্বর নিজেকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনিই ক্রমাশীল ঈশ্বর, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে এ জগতে নেমে এসেছেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই নামে ঈশ্বরদুহ পরিচিত হয়েছেন। এই নাম সলল নামের শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ এই নামেই মানবজাতি পরিদ্রাণ পেয়েছে। এই নামেই দৃষ্টি প্রতিকম্বী, দারীকভাবে প্রতিকম্বী, বাক প্রতিকম্বী, স্তম্ভরোপে অক্লান্ত অনেকেই সূক্ষ্ম হয়েছেন। এই নামেই অগদূত ভয়ে পালিয়েছেন। এই নামেই মৃত জীবন পেয়েছেন। আর এই নামের শক্তিতেই শিষ্যগণ যীশুর বাণী প্রচার করেছেন।

পাঠ ৩: খ্রিষ্ট নামের অর্থ

যীশুর ভাষা ছিল হিব্রু ও আরামীয়ক। পবিত্র বাইবেল লেখা হয়েছে হিব্রু ও গ্রিক ভাষায়। পরে তা লাতিন, ইংরেজি ও অন্যান্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাই বাইবেলে উল্লিখিত কিছু কিছু নাম বা শব্দ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এর উৎপত্তি আমাদের জানা প্রয়োজন।

‘খ্রিষ্ট’ একটি গ্রিক শব্দ। হিব্রু শব্দ ‘মশীহ’ থেকে এই শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে। মশীহ শব্দের অর্থ হলো “অভিষিক্ত”। তাই মশীহ বা খ্রিষ্ট শব্দের অর্থ হলো অভিষিক্ত। খ্রিষ্ট শব্দটি যীশুর নামের সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ তিনি পিতা কর্তৃক স্রেষ্ঠ ও অভিষিক্ত। তিনি খ্রিষ্ট হিসেবেই পরিচিত হয়েছেন। পিতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা তিনি পরিপূর্ণ করেছেন।

আমরা জানি যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমাজ বা জাতির মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরজন্য প্রথমে তাকে বেছে নেওয়া হয় ও মনোনীত করা হয়। কখনো কখনো কিছু সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎসর্গ করা হয়।

ইস্রায়েল জাতির মধ্যেও এমন কিছু সামাজিক প্রথা ছিল। ইস্রায়েলীয়দের রাজা, যাজক বা প্রবক্তাদের এভাবে বেছে নেওয়া হতো। বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাজের জন্য যারা উৎসর্গকৃত তাদেরকে অভিষিক্ত করা হতো। পবিত্র বাইবেলে এদূর অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল যীশুর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি একাধারে রাজা, যাজক এবং প্রবক্তা ছিলেন। তিনি অন্যান্য রাজাদের মতো নন। তাঁর রাজত্ব শান্ত ও চিরকালের।

যীশুর জন্মের পর স্বর্ণদূতেরা রাখালদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন “আজ দাউদ/দাভূদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক জ্ঞানকর্তা জন্মেছেন, তিনি খ্রিষ্ট প্রভু।” জন্মের আগে থেকেই পিতা যীশুকে বাছাই ও মনোনীত করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পবিত্র আদ্যার প্রভাবে।

পিতা তাঁকে পবিত্র করেই এ জগতে প্রেরণ করেছেন। বাপ্তিস্মের সময় প্রকাশ্যে পিতা ঈশ্বর মানুষের সামনে যীশুকে অভিষিক্ত করেছেন আর প্রকাশ করেছেন, “তুমিই আমার একমাত্র পুত্র, তোমার ওপর আমি সন্তুষ্ট।” এরই কালে ঈশ্বরমুখ উৎসর্গকৃত, পবিত্র ও মশীহ বা খ্রিষ্ট বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আর হুশে উৎসর্গকৃত হয়ে তিনি পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করেছেন।

পাঠ ৪: খ্রিষ্টই প্রভু

প্রভু ঈশ্বর সবকিছুর অধিপতি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছুর, এমনকি মৃত্যুর ওপরও তাঁর আধিপত্য আছে। “প্রভু” শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকে বোঝানো হয়। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যোশীর কাছে নিজেদের “প্রভু” বলে পরিচয় দিয়েছেন। সেই থেকে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরকে প্রভু বলে সম্বোধন করত। প্রভু বলতে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বোঝায়।

নতুন নিয়মে যীশুকে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেদের প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষকে পাপের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। নতুন নিয়মে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ তিনি স্বর্গের এবং মর্ত্যেরও প্রভু।

যীশু খ্রিষ্টই প্রভু। প্রচারকাজের বিভিন্ন সময় যীশু শিষ্যদের কাছে নিজেও এ কথা প্রকাশ করেছেন। অশ্বকো দৃষ্টি দান, খলকে চাপার শক্তি, বোঝাকে কথা কালার ক্ষমতা, অসুস্থকে সুস্থ করে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করেছেন। পাপীকে ক্ষমা করে এবং মৃতকে জীবন দিয়ে তাঁর ঈশ্বরিক শক্তির প্রকাশ করেছেন।

বীশুর প্রকাশ প্রচার জীবনে অনেকের নিরাময় লাভ করে তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করেছে। বীশুকে প্রভু বলার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। বীশুর পুনরুত্থানের পর মানুষের বিশ্বাস আরও গভীর হয়ে ওঠে। প্রেরিতশিষ্যেরা বীশুকে ‘প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার’ বলে স্বীকার করেন এবং ‘তিনিই প্রভু’ বলে প্রচার করেন।

আমরাও বীশুকে প্রভু বলে ডাকি। তাঁর নামে পিতার কাছে আমাদের প্রয়োজনের জন্য অনুনয় করি। কোনো কোনো প্রার্থনার শুরুতে তাঁকে ‘হে প্রভু বীশু’ বলে সম্বোধন করি। আবার সব প্রার্থনার শেষে ‘প্রভু বীশুর নামে’ বলে শেষ করি। কারণ তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং পিতা তাঁকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা বীশুর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ এনে দিয়েছেন। তার ক্ষমতা, সম্মান ও গৌরব মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

কাজ: বীশু খ্রিষ্ট কীভাবে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তার ২টি উদাহরণ লেখ।

পাঠ ৫: খ্রিষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ

এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু বীশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের অধিভীম পুর হিসেবে জানতে পারব। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, বীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়ে অন্যতরন করেছেন। তিনিই ঈশ্বর ও প্রভু। আমরা বীশু নামের অর্থ বুঝতে পেরেছি এবং খ্রিষ্ট হিসেবে তাঁর পরিচয় পেয়েছি। খ্রিষ্টের শিষ্য হিসেবে আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি এবং স্বীকারও করি।

এই অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনার আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বীশু ঈশ্বর, আবার তিনি মানুষ। বীশু ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়েছেন। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ।

একজন মানুষের থাকে সেহ, মন ও আত্মা। সেহ-মন-আত্মার প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্ম নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ মানবীয় স্বভাবে বেড়ে ওঠে। মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টির অন্যান্য সবকিছু থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি, যা অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তু বা প্রাণীর নেই। তাই মানুষ অন্যদের জীবজন্তু আলাদা।



পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ মানুষ বীশু খ্রিষ্ট আত্মোৎসর্গ করেছেন

নারীপর্তে জন্ম নিয়ে বীশু সেহ-মন-আত্মার প্রকৃতি পেয়েছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ মানবীয় স্বভাবে বড় হয়েছেন। মানুষের হাসিকান্না, দুঃখবেদনা কিংবা আনন্দের সাথে তিনি একাত্ম হয়েছেন। তিনি আকারে- প্রকারে ও স্বভাবে সম্পূর্ণ মানুষ। বীশুর মানবীয় স্বভাবে নিয়ে বিভিন্ন ভাষা মতভেদ ছিল। মডলীর পরিচালকণ এবং পণ্ডিতগণ এই সভ্য প্রকাশ করেছেন যে, বীশু ঈশ্বর থেকে আগত মানুষ।

বীশুর দুইটি স্বতাব: মানবীয় ও ঐশ্বরিক। তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণমানুষ। মানবীয় সেহ, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর সকল কাণ্ডাবিশিষ্ট জন্ম তিনি প্রকৃত মানুষ। মানুষ হয়েও তিনি আলাদা। কারণ তিনি মানুষ ও ঈশ্বর। ঈশ্বরত্ব ও প্রভুত্ব তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর। তিনি ক্লেশবিশ্ম হয়ে সূচ্যবরণ করেছেন। তারপর কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি মানবজাতির পরিত্রাণ

এনেছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সকলে স্বর্গে যাবার সুযোগ পেয়েছি। বারো বিশ্বাসের পথে চলে তারা পায় নবজীবন। কারণ বীণুই পথ, সত্য ও জীবন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. _____ প্রসাদে পূর্ণ বলে তিনি অভিহিত করলেন।
২. ঈশ্বর তাঁর _____ আছেন।
৩. তাঁর নাম হবে _____।
৪. তিনিই হবেন সমগ্র মানবজাতির _____।
৫. মোশী নামের অর্থ হলো _____ থেকে টেনে তোলা।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ভূমিই জামর	■ জয় করেছেন
২. বীণু মৃত্যুকে	■ বীণু আলাদা
৩. বীণুই পথ	■ প্রকৃত মানুষ
৪. তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও	■ একমাত্র পুত্র
৫. মানুষ হয়েও	■ সত্য ও জীবন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্রিষ্ট শব্দের অর্থ কী ?
 ক. মনোনীত
 গ. অভিহিত
 খ. প্রেরিত
 ঘ. উৎসাহকর্তা
২. 'প্রভু' শব্দের দ্বারা বীণুর কী বোঝানো হয়েছে ?
 ক. অদৌকিক শক্তিকে
 গ. বাজকত্বকে
 খ. ঐশ্বরিক শক্তিকে
 ঘ. রাজকীয় অধিকারকে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দীপ একজন ধার্মিক ব্যক্তি। সে বাণী প্রচারের জন্য 'ক' অঞ্চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে সেখানেকার লোকজন নেশা থেকে পুর করে যাবতীয় অসামাজিক কাজে পিণ্ড ও শারীরিকভাবে অসুস্থ। দীপ প্রার্থনা, সেবা ও বাণী প্রচারের মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলে।

৩. দীপ করার কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত কাজ করেছিল ?
 ক. পিতর
 গ. পৌল
 খ. বীণু
 ঘ. যোহন

৪. যীশুর কাজের মাধ্যমে 'ক' অঞ্চলের লোকেরা পেতে পারে

- i. নতুন জীবন
- ii. সেবা
- iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

স্বজনশীল প্রশ্ন

১. জুই ডেনির বাগদস্তা স্ত্রী। ডেনি গরিব হলেও ধার্মিক, ঈশ্বরভীরু ও বিনয়ী লোক ছিলেন। তিনি সামান্য বেতনে একটা কারখানায় কাজ করতেন। তিনি নিজেই তার স্ত্রীর অযোগ্য পাত্র মনে করতেন। তাই তিনি গোপনে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইতেন। তিনি ফাদারের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। কিন্তু ফাদার ডেনিকে জুই সম্পর্কে বললেন, 'জুই একজন সরল, বিনয়ী ও ঈশ্বরভক্ত মেয়ে। তুমি জুইকে গ্রহণ করতে ভয় পেও না।' ফাদারের কথামতো ডেনি সবকিছু করলেন।

ক. যুসেফা পেশের রাজ্যের নাম কী ?

খ. ঈশ্বর মারিয়ার গর্ভে কেন প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন ?

গ. যোসেফের কোন বৈশিষ্ট্য ডেনির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্ভিদকটি যোসেফের ঘটনার সঙ্গে আর্থিক মিল রয়েছে—এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

২. প্রশান্ত অঞ্চলের একজন সমাজসেবক। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তিনি খুবই ধার্মিক। গ্রামের দীন দরিদ্রকে ঔষধ, কাপড় ও খাবার দিয়ে তিনি সাহায্য করে থাকেন। গ্রামবাসী প্রশান্তের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে রোগীদের তার কাছে নিয়ে আসতে লাগল যাতে তিনি তাদের স্পর্শ করে সুস্থ করে তোলেন। তিনি লোকদের বললেন, 'আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র যীশুই পারেন এ কাজ করতে।'।

ক. মোশীহ শব্দের অর্থ কী ?

খ. যীশুকে কেন 'প্রভু' সম্বোধন করা হয় ?

গ. প্রশান্তের মধ্যে যীশুর কী ধরনের গুণাবলি ফুটে উঠেছে — বর্ণনা কর।

ঘ. প্রশান্তের মধ্যে যীশুর সব গুণের সমাবেশ ঘটেছে বলে কি ভূমি মনে কর ? তোমার মতামত দাও।

সবিক্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন দূত মারিয়ায়কে সন্বেদ দিয়েছিলেন ?

২. মারিয়ার স্বামী কেমন লোক ছিলেন ?

৩. মারিয়ার পুত্রের নাম কী রাখা হয়েছিল ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুকে কেন খ্রিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

২. ঈশ্বরপুত্র কীভাবে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানব বর্ণনা কর।

৩. ঈশ্বরপুত্রের উপাধি কেন প্রভু দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সব সৃষ্টিই উত্তম। সকল সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে ঈশ্বরের মহত্বের প্রকাশ। ঈশ্বরের সৃষ্টির একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে, আর তা হলো ঈশ্বরেরই পৌরব। তিনি সুন্দর ও পবিত্র, তিনি বিশ্বময় বিরাজিত। সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছে সমস্ত সৃষ্টির ওপর আধিপত্য করার অর্থাৎ বড় নেতৃত্ব দান। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া মানুষের একটি অন্যতম দায়িত্ব। একই সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও পৌরব করা মানুষের কর্তব্য।



সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ‘প্রত্যেক সৃষ্টিই উত্তম’- ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সুন্দর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক প্রার্থনা করব।

পাঠ ১: পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানবজাতির পরিব্রাজনের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য গুরুত্বপূর্ণ। সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের সকল মূর্তি পরিকল্পনার তিস্তি, মূর্তির ইতিহাসের শূন্য। “আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরুর করলেন” (আদি পুস্তক ১:১)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুই সৃষ্টিকর্তা।

সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হয়েও স্বাধীন ইচ্ছার বলে মানুষ পাপ করেছে। মানুষের পাপের ফলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট বা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতেই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেছেন। পুত্রের আগমনে সৃষ্টি-রহস্যের পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের অধিতীয় পুত্র প্রভু বীশু খ্রিষ্টের বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছি। আদি থেকেই খ্রিষ্ট বীশুতে এই নব সৃষ্টির রহস্য স্থির করে রাখা হয়েছিল।

জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কোনো কিছুই সহায়তারও প্রয়োজন হয়নি। সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর সৃষ্টির দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর চোখে সেসব ‘উত্তম’ হয়েছে। ষষ্ঠ দিনে, সব সৃষ্টির শেষে, তিনি ‘সমস্তই অতি উত্তম’ বলে ঘোষণা করেছেন (আদি পুস্তক ১:৩১)। তাই আমরা করতে পারি ঈশ্বরের সৃষ্টি উত্তম।

“পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।” মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এর প্রধান কারণ হলো, ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন নিজের রূপ, প্রকৃতি ও স্বভাব। মানুষের মাঝে ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ করলেন। মানুষের সাথে কথন্থ স্থাপন করলেন।

সৃষ্টির অন্যান্য বস্তু ও প্রাণী থেকে মানুষ অলাদা। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সে অনন্য। মানুষ কোনো বস্তু নয় বরং ব্যক্তি। সেহ, মন ও আত্মায় এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষের আছে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিবেক ও ইচ্ছা শক্তি। মানুষ আত্ম-মর্যাদার অধিকারী। জ্ঞান ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের মহত্বকে অবিস্কার করতে পারে। তাঁর মহানুভবতা সে অনুভব করতে পারে, তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে পারে। একমাত্র মানুষই সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে।

সৃষ্ট মানুষের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই নর ও নারী উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষ। মানব ব্যক্তি হিসেবে নর ও নারী সমমর্যাদার অধিকারী। আবার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে তারা নারী ও পুরুষ। তারা কেউ কারোও অধীন নয় বা একজন আরেকজন থেকে ছোট বা বড় নয়।

ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন বেন তারা একে অপরের জন্য পরিপূরক হতে পারে। “মানুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়; তাই আমি তাঁর জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে” (আদি পুস্তক ২:১৮)। ব্যক্তি হিসেবে তারা একক আর নারী ও পুরুষ হিসেবে তারা পরস্পরের সহায়ক বা পরিপূরক। তারা উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অতি উত্তম।

পাঠ ২: সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ

জন্মের পর থেকে আমাদের বৃষ্টি ঘটে চলেছে। এই বৃষ্টির সাথে সাথে আমরা যা-কিছু পেখি তাই তার সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আগে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম ও জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখেছি। এই সুস্মর পৃথিবী নিয়ে রচয়িতাগল ছন্দ, কবিতা, গল্প, নাটক কিংবা প্রবন্ধ লিখেন। চিত্রের মাধ্যমেও অনেক সৃষ্টির সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেন। সৃষ্টির সৌন্দর্য নিয়ে সুন্দর সুন্দর গান রচিত হয় ও সুরে সুরে সৃষ্টির কদনা গীত হয়।

সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের এসব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তারই গৌরব প্রকাশ পায়, তাঁরই পুণ্যগান করা। সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে আমাদের ধ্যান ও সাধনা ব্যাপক। কারণ “সব কিছু তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল, আর যা-কিছু অস্তিত্ব পেল, তার কোনো কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি” (যোহন ১:১-৩)। সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন।



সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের প্রকাশ

“আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন” (আদি পুস্তক ১:১)। পরির শাস্ত্রের এই প্রথম লাইনটি ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজের সূচনা প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি নিজেকে ছাড়া ঈশ্বর অন্য যা-কিছু বিদ্যমান সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এ জগতে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে সমস্তই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরপুত্রের আগমনের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকাজের পূর্ণতা তিনি প্রকাশ করেছেন। আসলে তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। সবকিছু নির্ভর করে তাঁর ওপর। সবকিছুর মধ্য দিয়ে মূলত তিনি নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। যিনি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এক নিজেকে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য একটি জাতি গঠন করেছেন, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি “স্বর্ণ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন” (ইসাইয়া/যিশাইয় ৪৩:১)।

এই সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে মূলত ঈশ্বর তাঁর প্রেম ও ভালোবাসাকেই মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি ভালোবাসার উৎস, তিনিই ভালোবাসা। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে পারি।

কাজ: সৃষ্টির ওপর হুড়া, কবিতা বা অনুচ্ছেদ লিখে বা চিত্র অঙ্কন করে সৃষ্টি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর।

পাঠ ৩: প্রত্যেক সৃষ্টিই উদ্ভব

ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি ও সৃষ্টির উদ্ভবতা সম্পর্কে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় কথা হলো যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর সম্বন্ধে জানা আমাদের জন্য বুঝে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের পৌরবার্ষিক। সব সৃষ্টিই কোনো না কোনোভাবে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে। সমস্ত সৃষ্টিই অতি উদ্ভব। যিনি সব উদ্ভব করে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয় আরও কতই-না উদ্ভব।

সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বজগতের পূর্ণতা দিয়েছেন। অগণ সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু ছিল অন্ধকার, ঝাঁকা বা শূন্য। শূন্যতার মাঝে ঈশ্বর বিচরণ করতেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন তিনি সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করবেন। সে অনুশারে সৃষ্টির যথ্য দিয়ে তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। তিনি বললেন সৃষ্টি হোক, আর সাথে সাথে সৃষ্টি হলো। তিনি ছয় দিনে জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন। প্রতিদিনের সৃষ্টির পর ঈশ্বর তাঁর আপন সৃষ্টিকে ‘উদ্ভব’ বলে ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ দিনে সব সৃষ্টির শেষে ‘সমস্তই অতি উদ্ভব’ বলে ঘোষণা করেছেন (আদি পুস্তক ১:৩১)। আর সপ্তম দিনে তিনি সৃষ্টিকর্ম থেকে বিরতি নিলেন।

প্রতিদিনের সৃষ্টির শেষে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে দেখলেন। কির-বিল্লেরণ করলেন। নিজে নিজে মূল্যায়ন করলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সৃষ্টি ভালোই হয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন, ভালো অর্থাৎ ‘উত্তম’ হয়েছে।

কাজ: তেমন চারপাশে সৃষ্টির কী কী উত্তম হিসেবে দেখ তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সবই উত্তম। ঈশ্বর প্রতিদিন তাঁর সেই উত্তমতাকে উপভোগ করেছেন। যা উত্তম নয় তা হলো মানুষের পাপ, মানুষের পতন। পাপ ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় বরং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার। শোভ ও ভোগ-বিলাসিতার উদ্দেশ্যে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করা যায় না। মানুষের জীবনে এগুলোর প্রয়োজন ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃতি আমাদের জীবন দেয়, খাদ্য দেয় ও আমাদের রক্ষা করে। এক উত্তম আরেক উত্তমের সেবা করে।

মানুষ সৃষ্টির পর ঈশ্বর বলেছিলেন ‘অতি উত্তম’ কিংবা ‘সমস্তই উত্তম’। তাই ভূমিও উত্তম, আমিও উত্তম, সব মানুষই উত্তম। মানুষের এই উত্তমতা প্রকাশ পায় তার আধিপত্যে ও প্রভুত্বে। মানুষের উত্তমতাকে ধরে রাখতে হলে সৃষ্টির উত্তমতাকে রক্ষা করতে হবে।

সৃষ্টির যত্ন ও তার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথম তার নিজের উত্তমতা সন্দেহ করে রাখতে হবে। নতুবা সে সৃষ্টিকে উত্তমতার পথে পরিচালিত ও যত্ন করতে পারবে না। সৃষ্টিকে যত্ন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দাস হবার জন্য নয়। ভোগ বা ধ্বংস করার জন্য নয়। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নেবে; সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সেই সেবা পাওয়ার কারণেও মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুই প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং যত্ন করা প্রয়োজন।

প্রকৃতি নানাভাবে অত্যাচারিত, নির্ধাতিত ও শোষিত হচ্ছে। ফলে প্রকৃতিতে এর বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষায়নের যুগে ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন। এই সম্পদ গুলো নিজের ভিতরে থাকার সুযোগ পেলে আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। কেবল ক্ষমতাসীলীরাই নয়, দরিদ্র সমাজও যেন উপকৃত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

সৃষ্টির সম্পদ রক্ষা করতে হলে ভোগবিলাসিতার সামগ্রী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মানুষের জীবন এতে আরও সহজ-সরল হবে। ভূমি, জল, বায়ু অত্যধিক দূষিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির সম্পদগুলো মাত্রাধিকভাবে অপরিচ্ছন্ন ও নোড়া হয়ে যাচ্ছে। ভূমি, জল, বায়ু ইত্যাদির নিজস্ব সৌন্দর্য ও পবিত্রতা আছে। মৌসুমী কাছে ঈশ্বর জ্ঞানত বোপের মধ্য থেকে বলেছিলেন, “তেমনর পায়ের জুতা খুলে ফেল, কেননা যেখানে ভূমি দাঁড়িয়ে আছে তা পবিত্র ভূমি” (যোহান্নাস ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা বাটে। সেই মন নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে কিরণ করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া ও মানুষকে ভালোবাসা প্রয়োজন। সৃষ্টির পরিচর্যা ও মানব সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা ও ভালোবাসতে পারি। এতে সৃষ্টির উত্তমতাও রক্ষা পায়।

কাজ: প্রেপির সব শিক্ষার্থী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

- মানুষকে দিয়েছেন নিজের রূপ _____ ও স্বভাব।
- মানুষের পক্ষে _____ থাকা ভালো নয়।
- নারী ও পুরুষ হিসেবে তারা পরস্পরের _____।
- এক উত্তম আরেক উত্তমের _____ করে।
- সৃষ্টি কোনো না কোনোভাবে মানুষের _____ হয়ে আনে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

ডান পাশ	ডান পাশ
ক. দেহ, মন ও আত্মায়	■ কলুষিত স্থাপন করলেন
খ. মানুষের সাথে	■ অধিকারী
গ. মানুষ আত্মমর্যাদার	■ এক অনন্য সৃষ্টি
ঘ. সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে	■ অতি উত্তম
ঙ. তারা উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টিতে	■ মুক্তির ইতিহাসের শুরু

ব্যবহারিক প্রশ্ন

- ঈশ্বর কিসের মধ্য দিয়ে নিজের সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন ?
 ক. বাক্যের মধ্য দিয়ে খ. সৃষ্টির মধ্য দিয়ে
 গ. শীশুর মধ্য দিয়ে ঘ. আচর্যবাক্যের মধ্য দিয়ে
- ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে কী দায়িত্ব দিলেন ?
 ক. নতুন নতুন সৃষ্টি করার
 খ. সুখ ভোগ করার
 গ. পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করার
 ঘ. সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অসীম পাছপালা কেটে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্য তৈরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। তার এ পণ্য ব্যবহার করে মানুষ বিলাসিতা করে ও ঘর সাজিয়ে কিছু সুবিধা ভোগ করে। তবে তার কারখানার বর্জ্য প্যাকের নদীতে পড়ে পানি দূষিত হচ্ছে।

৩. যে শিক্ষা অসীমের মনোভাবের পরিবর্তন আনতে পারে তা হলো –

- i. সৃষ্টিকে ভালোবাসার
- ii. সহজ-সরল জীবনধারণের
- iii. ভোগ পরিহার করার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

অসীমের কর্মকাণ্ডে কী প্রকাশ পায় ?

- ক. ঈশ্বরের গৌরব
- খ. মানুষের কল্যাণ
- গ. নিজের স্বার্থ
- ঘ. সৃষ্টির উত্তমতা

স্বাধীনশীল প্রশ্ন

১. অপূর্ব একটি সুপার খামার তৈরি করেছে। খামারে রয়েছে গরু, বিভিন্ন জাতের পাখি, ইঁদুর-মুরগি, চারা-গাছ ও বিভিন্ন রকম ফলের বাগান। প্রতিদিনই সে অনেক আত্মরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে এগুলোর যত্ন নিয়ে থাকে। সে খামারের উন্নয়নের জন্য অনেক পরিশ্রম করে। গরুর দুধ ও বাগানের ফল বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। নিজের চাহিদা পূরণ করেছে সে দরিদ্রদের সাহায্য নিয়ে থাকে। এ কাজের মধ্য দিয়ে অপূর্ব ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করেছে।

- ক. যষ্ঠ দিনে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করলেন ?
- খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন ?
- গ. অপূর্ব মানুষ হিসেবে কোন দায়িত্ব পালন করেছে, ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. প্রভুটির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে অপূর্বের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে—উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২. দৃশ্যকল্প-১

সীমা শিক্ষাক্ষেত্রে মধুপুর অঞ্চলে গিয়ে দেখতে পেল শালকণ্ঠি খুব সুন্দরভাবে সাজানো, পাখির কলকাকপিতে মুগ্ধ। শালবনের দৃশ্য ও পরিবেশ সীমাকে মুগ্ধ করল।

দৃশ্যকল্প-২

বিষয় পরিবেশ নিবসে জয়া জানতে পারল যে, মানুষের গাছ কাটার কালে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণে পৃথিবী তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে বেশে। আর এ কারণেই প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। দিনের পর দিন পৃথিবী গরম হয়ে যাচ্ছে। জয়া মনে করে সৃষ্টিকর্তা এত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য, আর মানুষ তা ধ্বংস করছে।

ক. জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু কী রকম ছিল ?

খ. ঈশ্বর কেন মানুষকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছেন ?

গ. প্রথম দৃশ্যকল্পে ঈশ্বরের কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সৃষ্টিকে যত্ন ও ভালোবাসার মাধ্যমে জয়ার জন্য দৃশ্যের পরিবর্তন আনতে পারে বলে ভূমি মনে কর? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কী ?
২. মানুষের কর্তব্য কী ?
৩. ঈশ্বর যষ্ঠ দিনে কী সৃষ্টি করলেন ?
৪. মোশীকে জলন্ত কোপের মধ্যে ঈশ্বর কী বলেছিলেন ?
৫. ঈশ্বরের সব সৃষ্টি দেখতে কেমন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।
২. সুন্দর প্রকৃতিকে রক্ষা ও যত্ন করার দায়িত্ব মানুষকে দেওয়া হয়েছে- বিস্তারিত বর্ণনা কর।
৩. ঈশ্বর মানুষকে কেন নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন - বিস্তারিত বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মা। দেহটা হলো বাইরে এবং এর চাইতে গভীরে আছে আমাদের মন। মনটা দেখা যায় না কিন্তু মনে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তা বাইরে থেকে অনেকটা বোঝা যায়। সবচেয়ে গভীরে হলো আমাদের আত্মা। সেখানে পৌঁছতে আমাদের অনেক সময় লাগে। তথাপি সেখানে যা থাকে তা-ই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। আমাদের দেহ মরণশীল। দেহ নষ্ট হয়ে গেলে মনও নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা চিরদিন টিকে থাকবে। আমাদের এই অমর আত্মার সাথে ঈশ্বরের সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের দেহ, মন ও আত্মা মিলে হয় মানবসত্তা। এই শ্রেষ্ঠ মানবসত্তা আবার নারী ও পুরুষে সৃষ্ট। এই নারী ও পুরুষ সমমর্যাদার অধিকারী। এবার আমরা দেহ, মন ও আত্মাসম্পন্ন এই মানবসত্তার আরও গভীর অর্থ সম্পর্কে অবহিত হবো।



দেহ মন ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- দেহ ও আত্মাসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- আত্মা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষের দেহটি আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানুষ পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্ট তা বর্ণনা করতে পারব।
- দেহ-মন-আত্মা পবিত্র রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হবো।
- নারী-পুরুষ সঙ্গকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করব।

পাঠ ১: সেহ, মন ও আত্মসম্পন্ন মানুষ

মানুষ একই সময়ে সৈহিক, মানসিক ও আত্মিক। সেহ, মন ও আত্মা এক। একটি আমাদের মধ্যে খোসা, শাঁস ও বীজ থাকে। সবগুলোই আমাদের অংশ। তিনটি মিলেই একটি আমরা। তেমনি সেহ, মন ও আত্মা এক। এগুলো এক মানুষেরই তিনটি অংশ। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে: “শুধু পরমেশ্বরের মাটি থেকে ধূলা নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে হুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবাহু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।” পবিত্র বাইবেলের এই বাকী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষকে ইশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছামতোই সৃষ্টি করেছেন। সেহ, মন ও আত্মা দ্বারা তৈরি মানুষই হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমরা এবার সেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কে জানব।

মানবসেহ: মানুষের সেহ ইশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার অংশ। সেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির। কারণ মানবসেহ আত্মা দ্বারা সজীবিত। মানবসেহ খ্রিস্টসেহের অংশের পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে ওঠে। তাই মানুষের সেহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেহের যত্ন বা সেহের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সচেতন থাকতে হয়।

মানবসেহের গুরুত্ব: আমরা ইশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ইশ্বরের কোনো সেহ নেই। কিন্তু ইশ্বর মানুষকে একটি সুন্দর সেহ দান করেছেন। এই সেহ দৃশ্যমান এবং এর মাধ্যমে আমরা কাজকর্ম করে থাকি। মানবসেহে রয়েছে অনেকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মানবসেহের আছে মাথা, মুখ, নাক, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রয়েছে নিজ নিজ কাজ। যেমন মাথা দিয়ে আমরা চিন্তা করি, মুখ দিয়ে কথা বলি, কান দিয়ে শুনি, চোখ দিয়ে দেখি, হাত দিয়ে আমরা নানারকম কাজ করি, পা দিয়ে হাঁটচলা বা সৌভাগ্যমোড়ি করি। মানবসেহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা বিভিন্ন রকমের প্রতিদ্বন্দ্বীতাসের কষ্ট দেখে আমরা সেহের গুরুত্ব খুব সহজেই অনুভব করতে পারি। মানবসেহের একটি অঙ্গ বিকল হলে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয় মানবসেহ ব্যবহার করে আমরা সব ধরনের কাজ করে থাকি। অসুখ্য ইশ্বরের কাজ দৃশ্যমান মানবসেহের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। মানুষের নানারকম তাব ও অনুভূতির প্রকাশ মানবসেহের যথা দিয়েই হয়ে থাকে। অনেককে বলে থাকেন, মানুষের মুখের ভাষার চেয়ে তার সৈহিক প্রকাশ অনেক বেশি জোরালো। তাই মানবসেহ অতি গুরুত্বপূর্ণ।

মানবসেহের যত্ন ও পবিত্রতা রক্ষা করা: ইশ্বর আমাদের যে সেহ দান করেছেন তার যত্ন নেওয়া খুবই দরকার। অতিরিক্ত সাবধাণে বা দামি দামি জিনিসপত্র ব্যবহার করা মানেই কিছু সেহের যত্ন করা নয়। বরং সেহকে পরিচর-পরিছন্ন রাখা, নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করা, অসুস্থ হলে যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া, আবহাওয়া অনুযায়ী আরামপ্রদ পোশাক-পরিচ্ছদ পরা, নিয়মিত পরিশ্রম, ব্যায়াম ও বিশ্রাম গ্রহণ করা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সেহের যত্নের সাথে সাথে সেহের পবিত্রতার বিষয়টিও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। অনেক সময় মানুষ নানাভাবে সেহের অপব্যবহার করে থাকে। যেমন, নানারকম মাদকদ্রব্য সেবন করে, সেহের সঠিক যত্ন না নিয়ে বা নিজ সেহে নানারকম আঘাত করে সেহের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু ইশ্বর চান আমরা আমাদের নিজেদের সেহকে সম্মান করি এবং অন্যদেরকেও সম্মান করি।



ব্যায়ামের মাধ্যমে সেহের যত্ন

দেহগত দিক থেকে আমরা যে যেমন আছি ঠিক সেইভাবেই নিজেকে গ্রহণ করা আমাদের দরকার। দেহের আকার, গঠন, গায়ের রং এগুলোকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েও আমরা আমাদের দেহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। দেহ ব্যবহার করে আমরা বেন কোনো প্রকার পাশ না-করি। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। এই দেহে ঈশ্বর নিজেই বাস করেন।

কাজ: নিজের পাতায় নিচের হকটির মতো একটি ছক আঁক। উল্লিখিত অঙ্গগুলো যা যা করতে পারে এমন তালিকা তৈরি করে। কাজ শেষ ও পাশের জনের সঙ্গে সহযোগিতা কর।		
মুখ	হাত	পা
চোখ	কান	মুখ

এসো একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পাই:

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যতো বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা আমার কানের শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা আমার আলাপোনা।
সব দিতে হবে, সব দিতে হবে।

পাঠ ৩: মানবদেহের অপব্যবহার

ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এ মহানান মানুষ সবসময় সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। দেহের অপব্যবহারের ফলে মানুষ নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন: কর্ত্রমানে এইভস রোগ তার মধ্যে অন্যতম। আত্মহত্যা করেও মানুষ দেহের অর্মান্দা করে থাকে। নিজেকে ঠিকভাবে গ্রহণ না করলে বা নিজের দেহকে নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে আমাদের নানারকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্রের কারণে মানুষ তার সঠিক যত্ন অনেক সময় দিতে পারে না। এ কারণে আমরা পথে ঘাটে, ময়শার মধ্যে পোকদের গড়ে থাকতে দেখি। এসব দৃশ্য সত্যি দুঃখজনক। কখনো কখনো মানুষ মানুষকে শারীরিকভাবে নির্বাতন করে থাকে। অনেক সময় খুনও করে থাকে। আজকাল আমরা প্রতিদিন তা শুনতে ও দেখতে পাই। নারী ও শিশুরা শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হয় ও বৌন হয়রানির শিকার হয়। এতে মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। দৃষ্টিনায় কবলিত হয়েও মানুষের দেহ কতদূর হয়। এককথায় আমরা বলতে পারি যে, মানুষ কখনো নিজের ইচ্ছায় আবার কখনো পরিস্থিতির শিকার হয়ে তার এই সুন্দর দেহের অপব্যবহার করে থাকে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী: মানব সমাজে কেউ কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসেবে অনুগ্রহণ করে। তাদের অনেক কষ্ট। তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সমাজের এই ধরনের মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা বেন তাদের প্রতি সন্তদয় হই। তাদের বেন প্রয়োজনমতো সাহায্য-সহযোগিতা করি। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেকবার পড়েছি, যীশু অনেক শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীকে সুস্থ করে তুলেছেন। এইভাবে তিনি আমাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

কাজ: সৈনিক প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের প্রতি আমাদের করণীয় কী? দলে আলোচনা কর। তোমাদের বাড়ির আশেপাশে কোনো প্রতিবন্ধী থাকলে তোমরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পার। এরপর তাদের জন্য কী করা যায় তার সিদ্ধান্ত নাও।

পাঠ ৪: মন ও মনের গুরুত্ব

ইশ্বর আমাদের সেহ ও আত্মার সাথে দিচ্ছেন একটি মন। এই মন দিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি। যা চিন্তা করি তা অনুভব করি এবং যা অনুভব করি তা-ই আমরা কাজে পরিণত করি। মন থেকে আমরা পাই মানসিক শক্তি। মনীষীগণ বলেছেন, মানুষের মন অনেক শক্তিশালী। মন থেকে আসে ইচ্ছাশক্তি। মনের জোর বা শক্তিকে কলা হয় মনোবল। এই মনোবল হলো মানুষের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। এটি পবিত্র আত্মার একটি বিশেষ দান। তাই মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতাও নির্ভর করে মানুষের মনের সুস্থতা বা অসুস্থতার ওপর। অন্যদিকে আবার সেহের সুস্থতা বা অসুস্থতা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেহ ভালো থাকলে প্রায়ই দেখা যায় মনটাও ভালো। আবার সেহ অসুস্থ হলে অনেক সময় মনটাও খারাপ হয়ে যায়। তাই মানুষ বলে থাকে— সুস্থ সেহে সুস্থ মন। মনের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ওপর মানুষের আত্মার সুস্থতা নির্ভর করে। মনের কারণে আমি আমার অপরাধ বুঝতে পারি। অপরাধ আত্মার ক্ষতি করে। মন যদি বলে যে আমি অপরাধ করেছি তবে তা আত্মায় প্রবেশ করে। এ কারণে মনের প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে মানুষ তার গোটা ব্যক্তিত্ব বা মানুষটিকেই প্রকাশ করে থাকে। মনের সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার ওপর একজন মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন নির্ভর করে। এই সকল কারণেই মনের গুরুত্ব অনেক।

এমনকি শারীরিক সুস্থতার চেয়েও মনের বা মানসিক সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হলেও স্বাভাবিক জীবন চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু একজন মানুষ যখন মনের দিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ হয় তখন স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মন হলো আমাদের চালিকাশক্তি। মনের শক্তি হলো বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধি দিয়ে আমরা সৃষ্টিসংগত চিন্তা করতে পারি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের জীবন। ইচ্ছাশক্তি থেকে জন্ম নেয় মানুষের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা থেকে আসে ভালো বা মন্দ বোঝার ক্ষমতা বা কিারবোখ। চিন্তাশক্তি সঠিক থাকলে মানুষের অন্য সব কাজ সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে মন নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করা হচ্ছে।

আমাদের বিশ্বাসের জীবনেও মনের গুরুত্ব ও প্রভাব অনেক। বিশ্বাস ও মন পরস্পর সম্পর্কিত। বিশ্বাসপূর্ণ আচরণ ও কাজসমূহ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মন দ্বারা। আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় মনোবলের কারণেই বিশ্বাসের জন্য সাধু-সংখ্যা জীবন দিতে প্রেরণাছিলেন। নানারকম কষ্টভোগ ও নির্ধাতন সহ্য করতে প্রেরণাছিলেন।

আবার অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, শারীরিকভাবে অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী হলেও মনের দৃঢ়তা ও উচ্চতর চিন্তা শক্তির কারণে মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আমরা বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিং ও হেলেন কেলারের নাম এখানে স্মরণ করতে পারি। তাঁরা শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও তাঁদের দৃঢ় মনোবল ছিল। এ কারণে তাঁরা মানবজাতির জন্য অস্বাভাবিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আবার অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে মানুষের শারীরিক সুস্থতাও মনের সুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত। মন সুস্থ ও ভালো না থাকলে মানুষ অনেকবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের কারণে মানুষের উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও মানসিক রোগ হয়ে থাকে। মন ভালো না থাকলে অন্য কোনো কিছু করতেও ভালো পাশে না। মনকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সব কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে হয়। এ কারণে বড়রা সকলময় তোমাদের বলে থাকেন মন দাও, মনোযোগী হও, সব কাজে মনোনিবেশ কর।

মনের কাজ

মনের গুরুত্ব আমরা নিচয় বুঝতে পেরেছি। এবার আমরা দেখব মনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

- ১। মন হলো আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি। এই শক্তিকে আমরা বলে থাকি অন্তর্দৃষ্টি, যার মধ্য দিয়ে আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারি।
- ২। মন গোটা মানুষটিকে চালায় ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- ৩। মন চিন্তা করতে ও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- ৪। মন কোনো বিষয়ের যুক্তিসংগত বিশ্লেষণে সাহায্য করে।
- ৫। মনের একমাত্রতা কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।

মন ভালো রাখার উপায়

অনেক সময় খুব সহজেই আমাদের মন ধারণ হয়ে যায়। মনের গুরুত্বের কারণেই আমাদের মন ভালো রাখতে হবে। সেইজন্য আমাদের জানা সরকারী কীভাবে মন ভালো রাখা যায়। নিচে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

- ১। সব বিষয়ে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা;
- ২। আত্মবিশ্বাস রাখা;
- ৩। ইতিবাচক মনোভাব গোষণ করা ও অশক্তির দ্বারা প্রভাবিত না-হওয়া;
- ৪। ভালো চিন্তা ও ভালো কাজ করা;
- ৫। মূল্যবোধ নিয়ে সং জীবন যাপন করা ও নৈতিক জীবন ঠিক রাখা;
- ৬। সবার সাথে সন্তোষ বা সুসম্পর্ক বজায় রাখা;
- ৭। সামাজিকতা রক্ষা করা, আনন্দ নিয়ে উত্সব পালন করা;
- ৮। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও পরিবেশ সুন্দর রাখা;
- ৯। ভালো মানুষের সাহচর্য ও সান্নিধ্যে থাকা;
- ১০। সঠিক ও সং মানুষের পরিচালনা গ্রহণ করা।

এছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা আমরা নিজেরাও চিন্তা করলে বুঝতে পারি। তবে আমাদের মন ভালো রাখার দায়িত্ব নিজেদেরই।

কাজ: তোমার মন ধারণ হলে তুমি কী কর এবং মন ভালো হওয়ার জন্য কী করতে পার তা লেখ ও দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৫: সন্তা ও আত্মা

পবিত্র বাইবেলে সন্তা শব্দটি দিয়ে মানবজীবন বা পূর্ণ মানবব্যক্তিকে বোঝায়। এই সন্তার মাধ্যমে মানুষের আত্মাকেও বোঝায় যা সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। এই আত্মার কারণেই মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়েছে। আত্মা মানুষের মূল নীতিবোধকে বোঝায়। এই সন্তা ঈশ্বরেরই রচনা। ১৩৯ নম্বর সামসংগীত গীতসংহিতায় আমরা দেখতে পাই:

আমার অন্তরতম সন্তা তোমারই রচনা;

মাতৃগর্ভে তুমিই তো বুনে বুনে গড়েছ আমায়।

এই আমি, এই যে সৃজন, কত- না আচর্য অপতৃপ্ত,

সেই তেবে করি আমি তোমারই গুণগান;

সবার আড়ালে আমি হুজিলাম যখন রচিত,

সেই মাতৃগর্ভের গভীরে হুজিলাম যখন এই সেহের বয়ন,

তখন আমার সন্তার কোনো কিছুই তো ছিল না তোমার অপোচর।

আমরা বিশ্বাস করি এই সন্তাই ঈশ্বরের আবাস।

আত্মা

আমরা আগেই জেনেছি যে ঈশ্বর আমাদের একটি অমর আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই আত্মার কারণেই আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। সেহ থেকে আত্মার পার্থক্য হলো— সেহের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মা কখনো মরবে না। আত্মা হলো ঈশ্বরের দান। আত্মাকে আমরা বলি জীবন। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। পবিত্র বাইবেলে বলা আছে যে, “প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে হুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন এবং তার নাকে হুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।”

মানবসেহ আত্মিক সন্তা দ্বারা সজীবিত

মানুষকে আমরা সেহ, সন্তা, আত্মা— বাই বলি—না কেন সব মিলিয়ে মানুষ আসলে এক। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি মানুষ একটি সন্তা যা একই সময়ে সৈহিক ও আত্মিক। মানুষের সেহ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার সহচরী। শুধু সেহের কোনো গুরুত্ব নেই। আত্মার সফলত্ব এসে এই সেহ মর্যাদা লাভ করে ও সৌরবান্ধিত হয়। আত্মিক সন্তা দ্বারা মানবসেহ সজীবিত হয় অর্থাৎ জীবন পায়। এই সেহ খ্রিষ্টসেহের অশ্রুয়ে পবিত্র আত্মার মন্দির হওয়ার জন্য সৃষ্ট।

১। আত্মা ও সেহের সম্পর্ক অতি নিবিড়। আত্মিক সন্তার কারণে মানবসেহ সজীব হয়ে ওঠে। সেহ ও আত্মা মিলে একটি অতিম্ন মানুষ গড়ে ওঠে, যার মধ্যে তার স্বভাব প্রকাশ পায়।

২। প্রতিটি আত্মিক সন্তা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, তা শুধুমাত্র পিতামাতার দ্বারা উৎপন্ন নয়। মানুষের আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যুর সময় সেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি, অন্তিম দিনে পুনরুত্থিত সেহের সাথে তা আবার এক হবে।

ও। সাধু পল/পৌল প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বর তাঁর জনগণকে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করে তোলেন : “তাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ প্রভৃ বীণু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিশ্চিনীয় করে রাখেন।” এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ তার আপন যোগ্যতার অনেক বেশি উর্ধ্বে এবং বিশেষ অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমেই সে ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য উন্নীত হতে পারে।

এই বিষয়গুলো অতি নিপুণ ও রহস্যময়। আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝতে পারা কঠিন কিন্তু বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তা গ্রহণ করি। এটি হলো ধ্যানের বিষয়।

কাহ্ন: একটি সুন্দর ও নীরব পরিবেশে সবাই শান্ত হয়ে বস। চোখ বন্ধ কর। পাঁচ মিনিট ধ্যান কর। তোমাকে ঈশ্বর দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

পাঠ ৬: মানুষ পুণ্য ও নারীত্বশে সৃষ্ট

মানুষ যেন একা না থাকে, সেই জন্যে ঈশ্বর প্রথমে এই সুন্দর পৃথিবী ও গ্রাসিকুল এবং অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে তিনি সৃষ্টি করলেন পুরুষ। এই প্রথম মানুষ হলেন আদম। তাকে তিনি রাখলেন স্বর্গের এডেন বাগানে। কিন্তু ঈশ্বর আদমের নিঃসঙ্গতা বুঝতে পারলেন। তাই একসময় ঈশ্বর বললেন: “মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্যে এমনই একজনকে গড়ে তুলবো যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে।” ঈশ্বর মাটি দিয়ে স্লেজিমির সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখিকে সৃষ্টি করলেন। তারপর মানুষকে তিনি বললেন সমস্ত প্রাণীদের নাম রাখতে। মানুষ অর্থাৎ আদম সবকিছুর নাম রাখলেন। কিন্তু এসব প্রাণীর মধ্যে মানুষের সঙ্গী হবার মতো কাউকে পাওয়া পেল না। কারণ মানুষ অন্য পশুপাখির চেয়ে আলাদা। মানুষের প্রকৃত অভাব নিঃসঙ্গতা তখনো মিটেনি।

তখন ঈশ্বর আদমের ওপর নামিয়ে আনলেন এক তন্তুর ভাব। সে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময় তার একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি মাসে দিয়ে শুই অঙ্গাঙ্গি ঢেকে দিলেন। তার বুক থেকে খুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু ঈশ্বর গড়ে তুললেন একটি নারী বা হবাকে, তারপর মানুষের কাছে তাকে নিয়ে এলেন। তখন মানুষ বলে উঠল:

“অবশেষে এ-ই তো আমার অস্থির অস্থি, আমার মাংসের মাংস। এর নাম হবে নারী, কেননা নরসেই থেকেই একে তুলে আনা হয়েছে।”

সেই জন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্বর্গীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারা দুইজন একদেহ হয়ে ওঠে। এভাবেই সৃষ্টি হলো পুণ্য ও নারী।

নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা ও পার্থক্য

ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমের মতো করে নারী অর্থাৎ হাওয়ারাকে সৃষ্টি করলেন, যার স্বরূপ একবারে তাঁরই মতো। পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টি অবলম্বন করে আদমের জীবনসজ্জিনীর সৃষ্টি হয়নি। বরং মানুষের দেহটির এক অংশ নিয়েই সে তৈরি হয়েছে। তাইতো মানুষ নারীকে দেখামাত্রই বুঝতে পেরেছে, সে-ই তার যোগ্য সঙ্গিনী। তাঁর সঙ্গে তার দেহ মনের আত্মীয়তা বা সম্পর্ক রয়েছে। তারা দুইজনেই সমানভাবে মানবসত্তার অধিকারী, কিন্তু ভিন্নভাবে। কারণ পুরুষ পুণ্যই আর নারী নারীই। তাদের দুইজনেরই প্রথম পরিচয়— তারা মানুষ। তবে তারা পরস্পরের পরিপূরক। এ কারণেই

তারা একে অন্যের সাথে মিশিত হতে চায়। তারা পরস্পরের প্রতি মিলনের আকর্ষণ অনুভব করে। তবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা ও পার্থক্যসুতো স্পর্শকে ধারণা থাকতে হবে।

সমতা	পার্থক্য
১। ইশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নারীকেও তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।	১। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। বিশেষত পুরুষ ও নারীর যৌন অঙ্গাঙ্গী ভিন্ন। এর মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাছাড়া পুরুষের দেহ তুলনামূলকভাবে শক্ত; কিছু নারীর দেহ কোমল। গোপাঙ্ক-পরিচ্ছদেও পার্থক্য আছে।
২। পুরুষ দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে যেমন মানুষ, নারীও তর দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে একজন মানুষ।	২। ইশ্বরপ্রদত্ত বিশেষ কিছু ক্ষমতা পুরুষ ও নারীভেদে ভিন্ন। যেমন নারীদের সন্তানধারণ ও জন্মদানের ক্ষমতা আছে, যা পুরুষদের নেই।
৩। পুরুষের যেমন লৈঙ্গিক, আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন রয়েছে মানুষ হিসেবে নারীর প্রয়োজনও একই রকম।	৩। তার বিনিময়, আবল-অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে বা কাজ করার ধরনের বেশ ভিন্নতা লক্ষ্যীয়। পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত কঠোর, সব অনুভূতি সহজে প্রকাশ করতে পারে না। নারীরা তুলনামূলকভাবে কোমল ও আবেগপ্রবণ।
৪। পুরুষের যেমন আত্মমর্যাদাবোধ ও অধিকার রয়েছে, নারীর রয়েছে সমান মর্যাদাবোধ ও অধিকার।	৪। পুরুষেরা শারীরিক শক্তি বা বাহুবলে বিশ্বাসী। নারীদের জোর থাকে মন ও হৃদয়ে। নারীদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বেশি।
৫। পুরুষসুলভ অনেক গুণ নারীর মধ্যেও আছে এবং নারীসুলভ অনেক গুণ পুরুষের মধ্যেও আছে।	৫। গুণগত দিক থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে।
৬। নারীরা পুরুষের মতো যে-কোনো কাজ করার যোগ্যতা রাখে।	৬। সামাজিক বিকেন্দ্রায় বিশেষভাবে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ও পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। নারীদের নানাতাবে হেয় করা হয়। অনেকভাবে তাদের অধিকারবঞ্চিত করা হয়। পুরুষ ও কন্যাশিশুর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য লক্ষ্যীয়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো আমরা সাধারণভাবে খেয়াল করে থাকি। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে একজন পুরুষের ৫১% ভাগ হলো পুরুষসত্তা এবং বাকি ৪৯% ভাগ হলো নারীসত্তা। এই দুই মিলে হলো একজন পরিপূর্ণ পুরুষ। আবার একজন নারীর ৫১% ভাগ হলো নারীসত্তা এবং বাকি ৪৯% ভাগ হলো পুরুষসত্তা। এই দুই মিলে হলো একজন পূর্ণ নারী। কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়ে ইশ্বরের সৃষ্টি। ইশ্বরের দৃষ্টিতে তারা সবাই সমান। তারা ভিন্ন হলেও পরস্পরের পরিপূরক ও তারা সমান। তারা কেউ হেট বা বড় নয়। বরং তারা মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী।

কাজ: তোমার পরিবার বা আশেপাশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে বৈষম্য ও পার্থক্যগুলো তুমি সেখান থেকে পড়া পাঠি লেখ এবং হেট দলে সহভাগিতা করা।

অনুশীলনী

মূল্যস্থান পূরণ কর

১. সামাজিক বিবেচনায় বিশেষভাবে _____ সমাজে পুঙ্খ ও নারীর মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য করা হয়।
২. ইশ্বর আমাদের _____ আত্মা সৃষ্টি করেছেন।
৩. _____ হলো ইশ্বরের দান।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আত্মা মানুষের	■ তৈরি মানুষই হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ
২. মানুষের দেহ	■ মূল নীতিবোধকে বোঝায়
৩. মানুষের আত্মা	■ ইশ্বরের প্রতিমূর্তির মর্যাদার সহভাগী
৪. দেহ, মন ও আত্মা দ্বারা	■ অবিনশ্বর
৫. ইশ্বর আমাদের	■ একটি সুন্দর দেহ দান করেছেন

সহনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের চালিকাশক্তি কোনটি ?
ক. দেহ
খ. মন
গ. পা
ঘ. মাথা
২. আত্মা বলতে কী বোঝায় ?
ক. মানুষের সত্তা
খ. মানুষের দেহ
গ. ইশ্বরের দান
ঘ. ইশ্বরের সাদৃশ্য

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৌতম ও যোয়াকিম ভাগে বশু ও ইশ্বরভক্ত। যোয়াকিম শ্রেণিতে সবসময় পিছনের বেঞ্চে বসে, শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিধাবেধ করে। কিন্তু পৌতম তার বিপরীত। পৌতম, যোয়াকিমের এই অবস্থা লক্ষ করে তার দিকে এগিয়ে আসে ও সাহায্য করে। পরবর্তীতে যোয়াকিম ক্রিয়ালব্ধের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

৩. যোয়াকিমের চরিত্রে কোন দিকটির অভাব পরিলক্ষিত হয় ?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. ক্ষমতা | খ. মনোবল |
| গ. পবিত্রতা | ঘ. বিশ্বাস |

৪. পৌত্তমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে হবে –

- i. আত্মপ্রত্যায়া
- ii. উৎসাহী
- iii. কষ্টভোগী

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূক্ষ্মদর্শন প্রশ্ন

১. মি. বোসকের দুই সন্তান, রনি ও সুমি। খাবার খাওয়ার সময় মি. বোসকে রনিকে উৎকৃষ্ট খাবারের অংশটি থালায় তুলে দেন, কারণ খাবার ইচ্ছা রনি ডক্টার হবে। পড়াশুনায় ভালো করার জন্য রনি ও সুমিকে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেন। সুমি তার নিজের ইচ্ছায় পড়াশুনা করে। ফলাফলে দেখা যায়, সুমির একগ্রন্থতার কারণে পরীক্ষার ফলাফল রনির তুলনায় ভালো হলো।

- ক. ইশ্বর আলমকে সৃষ্টি করার পর কী ভাবলেন ?
- খ. আত্মা ও দেহের সম্পর্ক কেমন ?
- গ. বোসকের কার্যক্রমের আলোকে সমাজে নারীর অবস্থান ব্যাখ্যা কর ?
- ঘ. রনি ও সুমির চরিত্রের আলোকে নারী ও পুরুষের সমতার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

২. সৌরভ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু অন্যান্য ছেলের মতো সে স্বাভাবিক নয়। শারীরিকভাবে সে প্রতিবন্ধী। ইশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। প্রার্থনায় ইশ্বরের কাছে নিজের কাজ নিজে করার শক্তির জন্য প্রার্থনা করত। এতে তার জে.এস.সি'র ফলাফল ভালো হলো। সে সরকারি বৃত্তি পেল। অন্যদিকে তার কণ্ঠ পলাশ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও রং কাপো বলে মনোকাণ্ডে ভোগে। কোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে পারে না। ফলে মানসিক চাপের কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

- ক. দেহের যজ্ঞের সাথে সাথে কোন বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে ?
- খ. মানবদেহের অপব্যবহার কলতে কী বোঝায় ?
- গ. উদ্ভীপকে সৌরভের কী ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. পলাশ তার অবস্থা পরিবর্তনে কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারে বলে তুমি মনে কর। তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানব সত্তা কী কী নিয়ে হয় ?
২. মানবদেহ বিকল হলে কী হয় ?
৩. মানুষের আত্মার সুস্থতা কিসের ওপরে নির্ভর করে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মন ভালো রাখার উপায়গুলো কী কী ?
২. মানবদেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়, ব্যাখ্যা কর।
৩. নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমতা ও পার্থক্যগুলো লেখ।

চতুর্থ অধ্যায় পাপ

স্বজ্ঞানে মানুষ পাপ করতে পারে আবার অনেক পাপ করা থেকে সে বিরতও থাকতে পারে। তাই মানুষকে প্রথমেই পাপ করা বা না-করার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যারা নিজেকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তে অটল থাকে তারা পবিত্রতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে। যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা পালন করে না, তাদের মধ্যে অবহেলার ভাবই বেশি। আর যারা পাপ করা থেকে বিরত থাকার কোনো সিদ্ধান্তই নেয় না, তাদের মধ্যে পাপের চেতনার অভাব। এখানে আমরা পাপ-বী, পাপের প্রকারভেদে এবং পাপ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করব। এর মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পাপবোধ সম্পর্কে নতুন চেতনা জেগে উঠবে।



পাপের জন্য অনুতপ্ত ব্যক্তি

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- পাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাপের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- সন্তরিশু সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সন্তরিশু সময়ের মাধ্যমে ধূমপান ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সেবনের হাত থেকে দূরে থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পাপের ফল বর্ণনা করতে পারব।
- পাপ থেকে মুক্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- পাপ কান্ন থেকে দূরে থাকব ও সং জীবন হাপনে উদ্ভূত হবো।

পাঠ ১: পাপ

যে কাজ, কথা, চিন্তা বা অবহেলার দ্বারা আমরা ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসার বিরোধিতা করি অথবা ভালোবাসার সন্সর্ক থেকে দূরে চলে যাই, তা-ই পাপ। পাপ হলো বুদ্ধিশক্তি, সত্য ও শুশ্ব বিবেকের বিরুদ্ধে অপরাধ। পাপের মধ্য দিয়ে আমরা নিজের মধ্যে অথবা অন্য কোনো স্ট্রী বিষয়ে অতিরিক্ত আসক্ত হই। এই কারণে আমরা ঈশ্বর ও মানুষকে প্রকৃতভাবে ভালোবাসতে ব্যর্থ হই। পাপের কারণে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। পাপ মানুষের সুখ ও সুকেনমল স্বভাবকে ধ্বংস করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সংযতি বা সমন্বয়কে নষ্ট করে ফেলে। এখন আমরা বলতে পারি, পাপ হলো চিরকালীন বা শাস্ত বিধানের বিপরীতধর্মী চিন্তা, ইচ্ছা, কথা ও কাজ। অসিপাপের মতো আমাদের অন্য সকল পাপগুলো হচ্ছে অব্যাহতা ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। পাপ হলো ঈশ্বরকে উপেক্ষা করে নিজেকে ভালোবাসা বা নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া।

কাজ: একটু সময় নাও, নীরব হও ও চিন্তা কর, ধ্যান কর- জু্মি কোন প্রকার পাপ কর।

পাপের প্রকারভেদ

পাপের প্রকার ভসংখ্য। আমরা অনেকভাবে বিভিন্নরকম পাপ করে থাকি। পালাতায়দের কাছে পরে সাধু পল বলেছেন: আমাদের মধ্যে একটি নিম্নতর স্বভাব অর্থাৎ দেহ বা আবেগের বশে চলার স্বভাব রয়েছে। এই নিম্নতর স্বভাবটি পবিত্র আত্মার বিরোধিতা করে। আর এই নিম্নতর স্বভাবের বশে চললেই আমরা পাপ করি। এভাবে যে পাপগুলো করে থাকি সেগুলো হলো: ব্যভিচার, অসুচিতা, উজ্জ্বলতা, পৌণ্ডলিকতা, ভস্বমস্বসাদন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেযারোষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাডলামি, বেসামল ভোজ-উৎসব, আরও এই ধরনের সব কাজ। যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের সন্সর্কে এই সতর্কবাহীও নেওয়া আছে যে, তারা কখনো ঈশরাচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে না।

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন: পাপের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে এক অর্থে পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়, পরিকেশ-পরিশুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকেও করা যায়। আবার ঈশ্বর, প্রতিবেশী বা নিজের বিরুদ্ধে পাপ, আত্মিক ও সৈহিক কলুষতা, আবার চিন্তা, কথা, কাজ বা অবহেলানিত পাপ- এসব দৃষ্টিকোণ থেকেও পাপের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। প্রথমে দেখা যাক পাপের গুরুত্বের দিকটা। পাপের গুরুত্ব অনুসারে পাপকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা: মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ। নিচে এই দুইরকম পাপ সন্সর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ

মারাত্মক পাপ হলো ঈশ্বরের বিধান গুরুত্বভাবে লঙ্ঘন করা। এই পাপের কলে মানুষের অন্তরের ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নতর স্বভাবের প্রতি আসক্ত হয়ে জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য ঈশ্বরের কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে যায়। ঈশ্বর, যিনি পরম সুখ, তীর কাছ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জীবনের প্রাপণিক্ত ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়। মারাত্মক পাপের কলে মানুষ আত্মার দিক থেকে মরে যায়। যেমন: মানুষ খুন করা, ঈশ্বরনিন্দা করা ইত্যাদি।

অন্যদিকে লঘু পাপ হলো কম গুরুত্ব বিষয়ে নৈতিক বিধানের নির্দেশিত নীতি অমান্য করা। অর্থাৎ সামান্য বিষয়ে মানুষ যখন ঈশ্বরের অব্যাহ হয় তখন আমরা তাকে খণি লঘু পাপ। অনেক সময় মানুষ এই কাজগুলো করে পূর্ণ জ্ঞান অথবা সন্সর্ক সন্সর্কি ছাড়া। এখানে মানুষের অন্তরের ভালোবাসা সামান্য পরিমাণে ব্যাহত হতে পারে। তবে লঘু পাপের কারণে ভালোবাসা দুর্বল হয়। যেমন: মিথ্যা কথা বলা, মস্বাত্রিতিক্ত হাসি-ভাশালা করা, অত্যাধিক কথা বলা ইত্যাদি। এখানে মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো:

মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ

মারাত্মক পাপ	লঘু পাপ
১। গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা।	১। সামান্য বা ছোট বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করা।
২। ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং ঈশ্বর কল্পনা বঞ্চিত হলে মানুষ মারাত্মক পাপ করে।	২। লঘু পাপে ভালোবাসা দুর্বল হয়ে যায়। তবে পরিত্রাণার্থী কৃপা, ঈশ্বরের সাথে কলুষিত, ভালোবাসা তথা শান্তিত সুখ থেকে মানুষ পুরোপুরি বঞ্চিত হয় না।
৩। বিধেয় সহকারে, সৃষ্টিভিত্তিকভাবে মন্দকে বেছে নেওয়া মারাত্মক পাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।	৩। অজ্ঞতা বা পুরোপুরি না- বুঝে আত্মা পঙ্কন করা লঘু পাপের বৈশিষ্ট্য।
৪। ব্যক্তি, স্থান বা সময়ের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন: একজন অপরিচিত সোকার প্রতি সহিষে হবার চেয়ে নিজের জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি সহিষে হওয়া নিঃসন্দেহ অধিকতর মারাত্মক বিষয়।	৪। লঘু পাপের কোনোই বিষয়টি প্রয়োজ্য তবে কিছুটা শিথিলতা আছে।

পাপ বিষয়ে গভীরভাবে জানতে হলে করেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা আবশ্যিক। বিষয়গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ১। ঈশ্বরের ক্ষমা, পরিত্রাণ ও ঈশ্বর কৃপায় সর্বদা বিশ্বাস করা। কারণ তিনি অসীমমুগ্ধে ক্ষমাশীল। তিনি সবসময় অপেক্ষা করেন কখন আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসব। পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।
- ২। কখনো নিরাশ না-হওয়া। ঈশ্বরের ওপর সবসময় আস্থা ও আশা রাখা।
- ৩। পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- ৪। পাপের পথ পরিহার করার ইচ্ছা থাকা।
- ৫। সঠিক বিবেক গড়ে তোলা ও বিবেকের নির্দেশমতো পথ চলা।
- ৬। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করা।
- ৭। ঈশ্বর পাপকে ক্ষমা করেন তবে পাপীকে নয়— একথা সবসময় মনে রাখা।

কাজ: পাঁচটি মারাত্মক পাপ ও পাঁচটি লঘু পাপের নাম লেখ।

পাঠ ২: ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ

ঈশ্বর আমাদের দশটি বিশেষ আজ্ঞা দিয়েছেন যেন আমরা এই পৃথিবীতে তাঁর পথে চলতে পারি ও পবিত্র জীবন বাপন করতে পারি। পূর্বে আমরা আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে জান লাভ করেছি। পবিত্র জীবন বাপন করার ও পাপ থেকে বিরত থেকে সুস্থিত চলায় জন্য এই আজ্ঞাগুলোর মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো পালনে ব্যর্থ হলে আমরা পাপ করে থাকি। অর্থাৎ আজ্ঞাগুলোর মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞাগুলো রয়েছে তার মধ্যে পাপ সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া আছে। দশ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে পাপ করে থাকি সেগুলো হলো:

- ১। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করে বা অন্য কিছুতে আসক্ত হওয়া।
- ২। ঈশ্বরের পবিত্র নামের অবমাননা করে। অর্কারণে ঈশ্বরের নাম নিয়ে।

৩। বিশ্রামবার পালন না-করে ও প্রভুর প্রশংসা না- করে।

৪। পিতামাতা ও গুরুজনকে সম্মান না-করে।

৫। নরহত্যা করে।

৬। ব্যভিচার করে বা অবৈধ সম্পর্ক রেখে।

৭। চুরি করে।

৮। মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে।

৯। অন্যের জিনিসে লোভ করে।

১০। অন্যের স্বামী বা স্ত্রীতে লোভ করে।

কাজ: জুনি কীভাবে দশ আজ্ঞার বিধুন্নে পাপ না- করে চলতে পার তা চিন্তা করে লেখ।

পাপ-প্রবণতা

পাপ থেকে পাপের জন্য হয় বা পাপ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বারবার একই পাপকাজ রিপুন জন্য দেয়। সাতটি বিশেষ পাপ সত্যবাক্যে বলা হয় সত্তরিপু। সত্তরিপুর নামগুলো হলো: অহংকার, লোভ, ইর্ষা, ক্রোধ, কামুকতা, পেটুকতা ও আলস্য। এগুলো পাপের প্রধান কারণ বা এগুলো অন্যান্য আরও পাপ বা কুসংস্কারের জন্য দেয়। নিচে এই সাতটি রিপু বা পাপ-প্রবণতার ব্যাখ্যা করা হলো:

১। অহংকার : নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ভাবা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা; নিজেকে বা অধিকৃত প্রাধান্য দেওয়া। অহংকারের কারণে মানুষ ঈশ্বর ও মানুষকে সম্মান করা থেকে বিব্রত থাকে। আমরা জানি, স্বর্গসুতাদের পতন হয়েছিল কারণ তারা নিজেদেরকে বড় মনে করেছিল আর ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছিল। আমাদের আদি পিতামাতাও ঈশ্বরের সমান হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁরা অব্যাহা হয়েছিলেন ও পাপ করেছিলেন। বর্তমানকালেও আমরা দেখি এমন অনেক মানুষ আছে যাদের অনেক ধনসম্পদ বা টাকাপয়সা আছে বলে তারা অন্যদের খুব হেয় মনে করে। অনেকে তাদের অনেক সুখি বা বিশেষ গুণ আছে বলেও তারা নিজেদের খুব বড় মনে করে, আর খুব অহংকারী হয়ে ওঠে। এভাবে আমরাও অনেক সময় অহংকার করে পাপ করি।

২। লোভ: বা আমার নয় বা পাবার সম্ভাবনাও নেই তা নিজের করে পাবার বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা। লোভের বশবর্তী হয়েও মানুষ পাপ করে থাকে। যে জিনিস আমার নিজের নয় তা আমি নিজের করে পেতে চাইলে আমি লোভ করে পাপ করি। যেমন, ক্রাসে এক কবু অনেক সুন্দর একটি কলম স্কুলে নিয়ে এসে, সেটি দেখে আমি হয়তো মনে মনে কবুছি, এই কলমটি আমার চাই। এভাবে অন্যের জিনিসের প্রতি আমরা লোভ করে পাপ করি।

৩। ইর্ষা: অন্যের ভালো বা সুখ সহ্য করতে না- পারা বা তার জন্য মনে মনে কষ্ট পাওয়া। ইর্ষা হলো অন্যের ভালো সহ্য করতে না- পারা বা অন্যের ভালোর জন্য মন খারাপ করা। অনেকবার আমাদের এরকম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ক্রাসে যে মেয়েটি বা ছেলেটি প্রথম হয় বা শিক্ষক হয়তো বা কোনো এক শিক্ষার্থীর প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেন। আমি তা সহ্য করতে পারি না। মনে মনে আমার খুব রাগ হয়। তার বিরুদ্ধে নানারকম কথাও বলি। ইর্ষাপরায়ণ হয়ে আমরা একে অন্যের ক্ষতি করতে পারি। ইর্ষাপরায়ণ হয়ে ফরিসিরা বীশুকে ক্রুশে দিয়ে মেরেছিল।

৪। ক্রোধ: কোনো বিষয়ে রেগে যাওয়া।
ক্রোধ বা রাগ হলো কোনো বিষয়ে নিজের
মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা। খুদু ভাই
নয়, রেগে গিয়ে ক্ষতিকর কিছু করে ফেলা।
আমরা বলতে শুনিয়ে রেগে গেলে মানুষ বন্য
পশুর মতো হিংস্র হয়ে যায়।



ক্রোধের কারণে ঝগড়া

নিজেলাও লক্ষ করি, রেগে গিয়ে আমরা পরিকল্পনা নষ্ট করি, খারাপ কথা বলে ফেলি, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলি, অন্যকে
আঘাত করি। কখনো কখনো রেগে গিয়ে এক মানুষ অন্য মানুষকে মেরেও ফেলে। কিছু রাগ করে ক্ষতিকর কিছু করে
তার পরে মানুষ নিজের অপরাধ বুঝতে পারে ও অনুতপ্ত হয়।

৫। কামুকতা: ইশ্বর আমাদের যৌনবাসনা দিয়েছেন গঠনমূলক কাজে ব্যবহার জন্য। যখন এই বাসনার অপব্যবহার করি
তখন এটি পাপ। অনিয়ন্ত্রিত যৌন বাসনাকে বলা হয় কামুকতা। মানুষকে ভোগের জন্য কামনা, বিবর্ত করা, কটুক্তি
করা, লপসার দৃষ্টিতে তাকানো, সুনভাবে তাকানো ইত্যাদি হলো কামুকতার কিছু উদাহরণ। আজকাল আমরা প্রায়ই
সেখি ও শুনতে থাকি রমক যৌন অনাচার ঘটছে। শিশু, যুবতী-কেট নিরাপত্তা পাচ্ছে না। যৌনপ্রবৃত্তি মানুষকে পনুতে
পরিণত করে। যারা সবেমাত্র নয় তারা নানানভাবে পাপ করে থাকে।

৬। শেটুকতা: খাবারের প্রতি অতিরিক্ত লোভ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে চাওয়া ও খাওয়া, বার বার খেতে চাওয়া বা
দুইচোখে যা দেখে তাই খেতে চাওয়া ও খাওয়া। বৈঠে থাকার জন্য আমাদের খাদ্য সরকার। কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত
খাবার খাওয়া পাপ। শেটুকতার কারণে মানুষের নানানরকম অসুখবিসুখও হতে পারে।

৭। অলসতা: আধ্যাত্মিক চর্চা ও কাজের প্রতি অনীহা। আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অবহেলা করা এবং কাজ না-করে শরীর
বীড়িয়ে চলা। অকর্মণ্য অবস্থার সময় নষ্ট করা। ইশ্বর আমাদের সেই, মন ও আত্মা দিয়েছেন। আমরা যেন আধ্যাত্মিক
অনুশীলন ও কারিক পরিশ্রম করে সুপার জীবন যাপন করতে পারি। কিছু কিছু মানুষ পরিশ্রম করতে প্রস্তুত নয়। তারা
খুব অলস ও আর্দ্রাশ্রিয়। অলসতা করেও আমরা পাপ করি।

পাঠ ৩: সত্তরিশু দমন

সত্তরিশু যেহেতু পাপ বৃদ্ধির সহায়ক তাই আমাদের শিখতে হবে কীভাবে আমরা এই রিশুগুণলোকে বশ করতে পারি।

১। নতায়ার অনুশীলন, নিজের মতো করে অন্য সত্তরিশুকেও পুণ্ড্র দেওয়া ও সন্ধান করা;

২। লোভ না-করে নিজের যা বা যতটুকু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা;

৩। অনেকের ভালোতে খুশি হওয়া ও আনন্দ করা, প্রশংসা করা ও ইশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া;

৪। উগ্র স্বভাব পরিহার করে সর্বকিছুতে ও সব অবস্থায় কোমল ও মৃদু আচরণ করা;

৫। সবেমগুণের অনুশীলন করা;

৬। পরিমিত আহর গ্রহণের অভ্যাস করা;

৭। সকল বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং অবহেলা না করা।

কাজ: সত্তরিশুর মধ্যে কোন তিনটি রিশুর বশবর্তী হয়ে তুমি বেশি পাপ কর? আর পাপ না- করার শক্তি ঢেয়ে
ইশ্বরের কাছে একটি প্রার্থনা লেখ।

পাপের ফল

আমরা সবাই ভালো, সুন্দর ও সুখী জীবন বাশন করতে চাই। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। সুখী সুন্দর হোক, সব আদর্শগত শান্তি বিরাগ কনক, কোথাও কোনো দুঃখ-বিবাদ না ঘটুক— এটাই আমাদের সবার কামনা। কিন্তু প্রতিদিন আমরা নানাভাবে কষ্ট পাই, আমরা একে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকি। নিজেদের পাপ স্বভাবের যে ফল তা আমরা চারিদিকে দেখতে পাই। অর্থাৎ আমাদের পাপের ফল আমরা ভোগ করে থাকি। পাপের ফলে আমাদের মধ্যে দেখা যায়:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ১। অশান্তি ও অমিল | ৬। অন্যায় ও অন্যায়তা |
| ২। দুঃখ ও যন্ত্রণা | ৭। ঈশ্বর ও মানুষের সত্য সম্পর্ক নষ্ট |
| ৩। নানারকম অসুস্থতা | ৮। নিঃসজ্ঞতা |
| ৪। বিবাদ ও বিচ্ছেদ | ৯। হতাশা ও নিরাশা |
| ৫। দুঃখ ও মারামারি | ১০। মৃত্যু |

কাজ: পাপের ফলে তোমার ব্যক্তিগত জীবনে কী হয় তা দশে সহ্যাপিতা কর এবং একটি পোস্টার তৈরি কর।

পাঠ ৪: পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায়

আদি পিতামাতার মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাসে পাপ প্রবেশ করার সাথে সাথে দয়ালু পিতা ঈশ্বর মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিনিধি দিয়েছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে এ জগতে পাঠিয়ে তিনি মানবজাতির পরিদ্রাশ সাধন করবেন—এই প্রতিনিধি তিনি মানবজাতিকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি শূন্য চান আমরা পাপ থেকে মন ফেরাই এবং মুক্তিলাভ করি। তিনি আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের পাপ যত বড় বা যত বেশিই হোক—না কেন, তার চেয়ে ঈশ্বরের দয়ার পরিমাণ আরও অনেক বেশি। এই কথাটি আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। পাপী মানুষ হলেও আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই নিরাশ হয়ে না-বাই।

পবিত্র মঙ্গলমন্ডালের মধ্যে আমরা দেখতে পাই পাপী মানুষের প্রতি যীশু খ্রিস্টের দয়ার প্রকাশ। যোসেফের নিকট স্বর্ণদূত বলেছিলেন: “তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।” মুক্তির সত্যকার খ্রিষ্টপ্রসাদের কোয়ার্ড একই কথা প্রবোধ্য: “আমার রক্ত, নবজন্মের রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত।” আমাদের কোনোদুঃখ সাহায্য ছাড়া তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাদের সহযোগিতা ছাড়া তিনি আমাদের পরিদ্রাশ সাধন করেন না। কিন্তু মুক্তিলাভের অনেক উপায় তিনি দিয়েছেন। নিচে কিছু উপায় হিসেবে ধরা হলো:

- ১। বিবেকের সত্যতা ও মুক্তিলাভের আশায় পাপ সম্পর্কে সচেতন হওয়া;
- ২। নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করা;
- ৩। নম্রভাবে নিজের পাপ স্বীকার করা;
- ৪। পাপের জন্য অনুতাপ করা;
- ৫। পুনরায় পাপ না-করার প্রতিজ্ঞা করা;
- ৬। ঈশ্বরের দয়া ও কৃপায় বিশ্বাস রাখা;
- ৭। ক্ষমা করা ও ক্ষমা দানের মনোভাব পোষণ করা;
- ৮। মন পরিবর্তন করা ও স্বাধীন ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করা;
- ১০। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা ও তাঁর প্রেরণা মতো চলা;

১১। নিয়মিত প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করা;

১২। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীদের সাথে সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা।

কাজ: দুইদলে মিলে নিচের সামসংগীতটি প্রার্থনা কর।

ওগো ঈশ্বর, কে থাকতে পারবে বল, তোমার আবাসে?

কে-ই বা বাস করবে তোমার পবিত্র পর্বতে?

অনিদ্য যার আচরণ,

ন্যায়ধর্ম যে পালন করে,

অস্তর থেকে যে সত্যতাবধী

যার রসনা করে না পরান্দিয়া,

তাইয়ের যে করে না অপকার,

প্রতিবেশীর যে রটায় না দুর্নাম,

অষ্টকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখে,

ঈশ্বর তত্ত্বজনকে সম্মানই করে,

কৃতি হলেও আপন শপথের যে করে না অন্যথা,

ঋণ দিয়ে যে দেয় না কোনো সুদ,

নির্দোষের কৃতি কর্তে যে নেয় না কোনো ঘুষ,

এমনই যার আচরণ, সে তো কোনো কিছুতেই টলবে না কখনো

কাজ: কীভাবে পাপ থেকে মুক্তিশ্রান্ত করা যায় প্রথমে তা দশে আলোচনা কর। তারপর ব্যক্তিগতভাবে নীরব ধ্যান কর, মিছে মিছে সংকল্প নাও— তুমি কীভাবে পাপের পথ ত্যাগ করবে।

অনুশীলনী

মূল্যস্থান পূরণ কর

১. পাপ থেকে পাপের _____ হয়।
২. বৈচে থাকার জন্য আমাদের _____ দরকার।
৩. ঈর্ষা হলো অন্যের _____ সহ্য করতে না পারা।
৪. রাগ করে কঠিকর কিছু করে তার পরে মানুষ নিজের _____ বুঝতে পারে।
৫. লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ _____ করে থাকে।

৪. রামুল কীভাবে এ ধরনের পাণ-প্রবণতা পরিহার করতে পারে ?

- ক. নম্রতার অনুশীলন করে
- খ. উন্নত স্বভাব পরিহার করে
- গ. যথাসাধ্য চেষ্টা করে
- ঘ. সঙ্গমগুলোর অনুশীলন করে

সুজনশীল প্রশ্ন

১. জয়ন্ত প্রায়ই তার বাবার পকেট থেকে টাকা নেয়। কবুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটায়। তার কথাবার্তা ও চালচলনে অনেক পরিবর্তন দেখে তার বাবা একদিন ছেলেকে ডেকে টাকার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু জয়ন্ত তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। এভাবে সে দিনের পর দিন কবুদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। ধীরে ধীরে সে আরও বড় ধরনের অপরাধের সাথে নিজেই জড়িয়ে ফেলল।

- ক. ইশুরের বিধান অমান্য করা কী ধরনের পাণ ?
- খ. সাতটি রিসু বা পাণ-প্রবণতা কলতে কী বুদ্ধ ?
- গ. জয়ন্ত কী ধরনের কাজ করেছে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. জয়ন্তের কাজের ফলাফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর। পঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

২. (সোয়া, হোয়া ও সুমন একই এলাকার থাকে একই একই শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। সকলবেশে একসঙ্গে তিন জনের দেখা।)

- সোয়া : হোয়া কেমন আছ ?
- হোয়া : তোমার মতো খারাপ নেই। ভালোই আছি।
- সোয়া : স্কুলে বাবে না আছ ? চলো একসঙ্গে যাই।
- হোয়া : তোমার মতো হেঁটে যাব না কি ? আমি গাড়িতে যাব।
- সুমন : তুমি লেয়ার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ কেন ? টাকার গরম দেখাচ্ছ ? ইশুর তোমাকে শাস্তি দিবে।
- হোয়া : টাকার গরম দেখাব না। টাকাই সব। ইশুর আমার কিছু করতে পারবে না।
- ক. পাণ কী ?
- খ. দশু পাণ কলতে কী বোঝায় ?
- গ. হোয়া কী ধরনের পাণ করেছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হোয়া কীভাবে উক্ত পাণ থেকে মুক্তি পেতে পারে ? মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. করা অপরাধে বা ঐশরাভ্যে প্রবেশ করতে পারবে না ?
২. মারাত্মক পাণ কাকে বলে ?
৩. সত্তরিশুর নামগুলো লেখ ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পাণ থেকে মুক্তি লাভের উপায়গুলো লেখ।
২. পাপের ফল কী হতে পারে ? বর্ণনা কর।
৩. কীভাবে সত্তরিশু দমন করা যায় ?

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশুর জীবন ও কাজ

ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। তিনি ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্র প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন। বেন পুত্রের মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি (পরিদ্ধাণ) পায়। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজেই রক্ত করলেন। দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন। আকারে প্রকারে মানুষ হয়ে পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মরীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি মানুষকে মুক্তির বাণী দিলেন। নিজে শিক্ষাণ হয়েও মানুষের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তাঁর পুনরুত্থানের সহযোগী করলেন ও নতুন জীবন দান করলেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনটাই ছিল একটি নিপুণ রহস্য। আমরা এই অধ্যায়ে তাঁর জীবনের রহস্যের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করব। এছাড়া তাঁর প্রকাশ্য জীবনের আরও খেকে ফেটুসালেমে প্রবেশের বিভিন্ন দিকগুলো জানব।



জনতার কাছে প্রচাররত যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- যীশুর জীবনের প্রধান রহস্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দীক্ষাপূর যোজন কর্তৃক যীশুর দীক্ষান্নান বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর দীক্ষান্নানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দীক্ষান্নাত ব্যক্তি কীভাবে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠন ও সুন্দর সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে তা বর্ণনা করতে পারব।
- গালিলেয়ার যীশুর বাণী প্রচারের কাজ শুরুর কথা বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর ফেটুসালেমে প্রবেশের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিষ্যদের মতো করে যীশুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: যীশুর জীবনের প্রধান প্রধান রহস্য

রহস্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যা সাধারণ জ্ঞান-বুজি দিয়ে উল্কাটন করা যায় না। আমাদের সাধারণ বুজির অতীত বলে রহস্য বোঝার জন্য গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের মুক্তিপাতা প্রভু যীশুর জীবন, কাজ, ব্যাপী প্রচার, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সবকিছুর মধ্যেই গভীর রহস্য নিহিত রয়েছে। তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই যীশু বলেন, যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্ট মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছেন। তাই তাঁর রহস্যের ক্ষুদ্রতম বিঘটিও আমাদের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করে।

যীশুর সেধধারণ রহস্য: প্রভু যীশু খ্রিষ্ট তাঁর পিতার সাথে গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু সময়ের পূর্ণতা পিতা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুরস্কার দান করলেন মানুষের মুক্তির জন্য। তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সমতুল্যতাকে ঝাঁকড়ে ধরে রাখতে চাননি। তিনি নিজেকে একেবারে রিক্ত করেছেন। স্বর্গধাম থেকে তিনি মাটির ধরায় নেমে এসেছেন। মারীয়ার মতো একজন সাধারণ কুমারী কন্যাকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছেন মুক্তিদাতার মা হবার জন্য। তিনি মারীয়াকে সেভাবেই প্রস্তুত করেছেন। পাপপুণ্য করেই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমাদের ত্রাণকর্তা একটি নিরুস্কল গর্ভে জন্ম নিতে পারেন। কুমারী মারীয়া প্রথমে একটু বিব্রত হলো নিজেকে ‘প্রভুর দাসী’ বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছেন। মারীয়ার এই ‘হ্যাঁ’ বলার মধ্য দিয়েই মহান ঈশ্বর পুত্রের রূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসেছেন। আকাশ-প্রকারে মানুষ হয়ে নিজেকে একেবারে নমিত করেছেন। তাঁর এই সেধধারণের মধ্য দিয়ে তিনি দরিদ্র হয়েছেন, তাঁর দরিদ্রতায় তিনি আমাদেরকে ধনশালী করে তুলেছেন। তিনি সেধধারণ করে মানুষ হয়ে মানুষের সবকিছু নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিলেন। মানুষের জন্য মুক্তির এক সহজ-সরল পথ খুলে দিলেন। আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে যে স্বর্গসুখ আমরা হারিয়েছি, পুত্রের সেধ ধারণের মধ্য দিয়ে আমরা তা আবার ফিরে পেয়েছি। তিনি দরিদ্র বেশে এক গোশালায় জন্ম নিয়েছেন। দরিদ্র রাখালো ছিলেন তাঁর প্রথম সাক্ষী। তাঁরাই তাঁর জয়গানে মুখর হয়েছিলেন।

যীশুর নিস্তার রহস্য: যীশুর সম্পূর্ণ জীবনটাই পরিচাণের রহস্য। তিনি তাঁর প্রচারজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন একেবারে নীন-দরিদ্র, অতাবী, দুঃখী, নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের মাঝে। এর কারণ হলো মানুষ যেন মুক্তির স্বাদ পেতে পারে; দুঃখ, শোক, ব্যথাবেদনা ও পাপের বন্ধন থেকে যেন তারা মুক্তি পেতে পারে। তবে আমাদের কাছে তাঁর পরিপূর্ণ মুক্তি আসে কলভের পর্বতে ক্রুশের উপর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। তিনি নির্দোষ ও নিম্পাপ হয়েও নিজের ঈশে আমাদের পাপ বহন করেছেন। ক্রীণী হৃদয় মৃত্যু মেনে নিয়েছেন। তিনি সমস্ত কিছু সহ্য করেছেন। পিতার একান্ত বাধ্য হয়ে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁর রক্তমুখ্যের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করেছি। আমরা হয়ে উঠেছি স্বাধীন মানুষ।

যীশুর অপ্রকাশ্য জীবনের রহস্য: প্রভু যীশু খ্রিষ্টের নৈনদিন জীবন ছিল নিত্য সহজ-সরল। ধর্মীয় নিয়ম-নীতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা। তিনি পিতামাতার বুকে বাঁধা ছিলেন। তাঁর এই বাধ্যতা পিতা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাঁর মধ্যে যে ঐশ পিতার উপস্থিতি ছিল তা তিনি তাঁর পিতামাতাকে এই কথা বলে জানান, “তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার পুত্রই আমাকে থাকতে হবে?” তিনি যে পিতার বিশেষ প্রেরণাকে নিবেদিত তা তিনি শান্তভাবেই প্রকাশ করেছেন।

যীশুর মহিমা লাভের রহস্য: প্রভু যীশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তিনি সমাহিত হয়েছেন এবং তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। প্রভু যীশু খ্রিষ্টে নিজে পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তাঁর পুনরুত্থানের সহযোগী করেছেন। আমাদের মধ্যেও একটা প্রত্যাপন জন্ম নিয়েছে যে, এখানে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। আমরা একদিন খ্রিষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হবো। কারণ যীশু নিজেই আমাদের বলেছেন যে, আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে আমাকে বিশ্বাস করবে সে অনন্ত জীবন লাভ করবে। প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকে তাঁর অনন্ত জীবনের সহচরী হয়ে উঠেছি। যীশুর মহিমা আমাদেরকেও পরিচাণের মহিমায় মহিমাশ্রিত করে তুলেছে।

সুতরাং, প্রভু যীশুর সমগ্র জীবনই ছিল রহস্যে ভরপুর। তাঁর সেধধারণ থেকে শুরু করে বাতনাভোগের তিক্ত সিকি এবং পুনরুত্থানের শবকণ্ড পর্বত সবকিছুই ছিল যীশুর জীবনের রহস্যালুসের চিহ্ন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তা উদ্ঘাটন করতে হবে।

পাঠ ২: বীশুর দীক্ষাদান

আমরা অনেকেই শিশু অবস্থায় দীক্ষাদান বাপ্তিস্ম সাক্ষ্যমেন্ট গ্রহণ করেছি। প্রভু বীশু কড় হয়ে দীক্ষাদান গ্রহণ করেছেন। তবে প্রভু বীশুর দীক্ষাদান আমাদের দীক্ষাদান থেকে ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি দীক্ষাপূরু যোহনের কাছে মন পরিবর্তনের দীক্ষাদান গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যে দীক্ষাদান গ্রহণ করি সেই দীক্ষাদান বলতে আমরা বুঝি প্রভু বীশু খ্রিষ্ট কর্তৃক স্নানচিত ও মন্তনী কর্তৃক স্বীকৃত বাহ্যিক চিহ্ন বা প্রতীক। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ লাভ করি। প্রভু বীশু খ্রিষ্ট নিজে দীক্ষাদান গ্রহণ করে দীক্ষাদান সৎকারের একটি নতুন রূপ দান করেছেন। তা হলো জল ও আত্মায় নতুন জীবন লাভ।

প্রভু বীশু তাঁর প্রকাশ্যজীবন শুরু করেছেন জর্ডন/যর্দন নদীতে দীক্ষাপূরু যোহনের দ্বারা দীক্ষাদান গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। দীক্ষাপূরু যোহন মানুষকে পাপমোচনের উদ্দেশ্যে মন পরিবর্তনের আহ্বান করেন। তিনি এই বলে তাঁর মন পরিবর্তনের বাণী প্রচার করেন, তোমরা মন ফেরাও। তিনি মানুষকে মনের ঝাঁক-ঝাঁকা সমস্ত চিন্তা দূর করে সত্য ও সুন্দরের সহজ-সরল পথে চলতে আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক করুণাহক, ফরিসি, সাদুকি ও পাপী মানুষ মন পরিবর্তন করে দীক্ষাদান গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন বীশু নিজে দীক্ষাপূরু যোহনের কাছে এলেন দীক্ষাদান গ্রহণ করতে। তিনি নিষ্কাশন হলেন দীক্ষাদান গ্রহণ করেছেন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য। যোহন প্রথমে বীশুকে দীক্ষাদান দিতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন যে, তাঁরই বরং বীশুর কাছে দীক্ষাদান গ্রহণ করা উচিত। বীশু কিছু দমে যাননি। বীশু তাঁকে বললেন, যেন এখনকার মতো যোহন রাজি হন। অবশেষে যোহন বীশুকে দীক্ষাদান দিলেন। দীক্ষাদান গ্রহণ করার সাথে সাথে পবিত্র আত্মা এক কপোতের আকারে বীশুর উপর নেমে এলেন। আর তখনই স্বর্ণ থেকে এই বাণী শোনা গেল, “ইনি আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এর কথা শোন”। উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে তা শুনল ও দেখল। এই ঘটনাটি হলো ঈশ্বরপুত্র ও ইশ্রায়েলের মণীষ বা ত্রাণকর্তারূপে বীশুর আত্মপ্রকাশের আরম্ভ।

কাজ: বীশুর দীক্ষাদানের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাও।

বীশুর দীক্ষাদানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

বীশু খ্রিষ্ট নিজে দীক্ষাদান গ্রহণ করে পরমেশ্বরের কণ্ঠতোগী সেবক হিসেবে তাঁর প্রেরণকর্ম শুরু করেছেন। তিনি পাপী মানুষের সাথে নিজে থেকে গণ্য করেছেন। দীক্ষাদান গ্রহণ করে কলভেরিতে নিজের রক্ত খরিয়ে মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নিজে থেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর সেই সম্বন্ধিত প্রভুত্বের পিতা ঈশ্বরও তাঁর প্রতি প্রীত আছেন বলে ঘোষণা করলেন। বীশুর সেহবারগের সময় থেকে যে আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত ছিল সেই একই আত্মা তাঁর ওপর এসে বিরাম্ব করে। আদমের পাপের ফলে স্বর্গের সম্রাজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীক্ষাদানের কালে আমরা পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে বাবার সুযোগ পাই। পবিত্র আত্মার অবতরণের কালে এক নতুন সৃষ্টির সূচনা হলো।

দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিষ্টভক্ত প্রভু বীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে জল ও আত্মায় নতুন জন্মলাভ করে। প্রভু বীশুর মধ্য দিয়ে সে হয়ে ওঠে পিতা ঈশ্বরের একান্ত প্রিয়জন। সে চলতে পারে জীবনের নবীনতায়, যেখানে কোনো পাপ-কালিমা নেই। এভাবে দীক্ষাদান প্রত্যেক ব্যক্তিকে বীশুর পবিত্রতায় বেড়ে উঠার সুযোগ পায়।

কাজ: দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে কী পরিবর্তন হয়, তা দলে আলোচনা কর।

পাঠ ৩: যীশুর বাণী প্রচার যাত্রার শুরুর

প্রভু যীশু নীক্ষান্বেনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ্যজীবন শুরু করেন। নীক্ষান্বেনের পরপরই প্রভু যীশু মহাপ্রান্তরে নির্জনে চল্লিশ দিন সময় কটান। এ সময় তিনি পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে বনপ্রাণীদের সাথে বাস করেন। স্বর্গদূতেরা তখন তাঁর পরিচর্যা করেছেন। তিনি শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হন এবং শয়তানের উপর বিজয় খিনিয়ে আনেন। তারপর প্রচার কাজ শুরুর করার জন্য বার জন শিষ্যকে বেছে নেন।

বার দ্বারা প্রভু যীশু নীক্ষান্বেত হয়েছিলেন সেই নীক্ষাপুরুষ যোহনকে করাপারে বন্দী করা হলে পর যীশু গালিলেয়ায় চলে এসেন। গালিলেয়াতে তিনি তাঁর প্রচারকাজ শুরু করেন। তিনি বলতেন, “সময় হয়ে এসেছে: ঐশ্বরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মজাঙ্গলমাচারে বিশ্বাস কর।” তাঁর প্রচারের মূল বিষয় ছিল ঐশ্বরাজ্য এবং মন পরিবর্তন। আসলে ঐশ্বরাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি পিতার বাণী মানুষকে শুনিয়েছেন।

এই আফানে সাদ্কা দিয়ে অনেকে যীশুর অনুসরণ করেছেন। আবার কাটকে কাটকে তিনি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন ঐশ্বরাজ্যের সাক্ষী হতে। বাণীপ্রচারের শুরুরতে তিনি তাঁদের গালিলেয়া সাগরের ধার থেকে আহ্বান করেছেন। তিনি একদিন সাগরের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি সিমোন ও তার ভাই অন্ড্রিয়াকে সাগরে জাল কেশতে দেখলেন। তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন তাঁর অনুসরণ করতে। আর তাঁরা তাঁর ডাক শোনার সজো সজো যীশুর সঙ্গ নিলেন, তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। এরপর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের দুই ছেলে— যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে গেলেন। তাঁরা নৌকায় বসে তাদের জাল সারাচ্ছিলেন। যখনই যীশু তাঁদের ডাক দিলেন তখনই তাঁরা তাঁদের পিতা জেবেদকে নৌকায় মন্ডুরদের সজো রেখে যীশুর সজো চললেন। এভাবে তিনি অন্যান্যদেরও ডাকলেন এবং ঐশ্বরাজ্যের মর্মসত্য বুঝিয়ে দিলেন।

কাজ: যীশুর আহ্বানে সাদ্কা দিয়ে বারা যীশুর অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের যে কোন ৫ জনের নাম লেখ।

বাণী প্রচারের তাৎপর্য

পিতার ইচ্ছা পালন ও বাস্তবায়ন করাই ছিল প্রভু যীশুর এ জগতে বাণীপ্রচারের মূল বিষয়। আর পিতার ইচ্ছা হচ্ছে মানুষকে অনন্ত মুক্ত্য অর্থাৎ পাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা। এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ বাতে যীশুর প্রচারিত ঐশ্বরাজ্যের সহভাগী হতে পারে। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট ঐশ্বরাজ্যের প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষকে ঐক্যবন্ধ করে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ জনমন্ডলীই হচ্ছে খ্রিষ্টমন্ডলী, যা এ জগতে ঐশ্বরাজ্যের বীজ এবং সূচনা।

কাজ: তোমরা কীভাবে যীশুর পথ অনুসরণ করছ, সেই অভিজ্ঞতা দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪: যীশুর যেরুসালেমে প্রবেশ

প্রভু যীশুকে উর্ধ্বে তুলে নেওয়ার দিনগুলো যখন খুব কাছে এসে গিয়েছিল তখন তিনি পুণ্যনগরী যেরুসালেমে যাবার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন এই যেরুসালেমেই তাঁকে হত্যা করা হবে। তাঁর বাণীপ্রচারকালে তিনি তিনবার তাঁর শিষ্যদেরকে এই কথাটি মরণও করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রভু যীশু যেরুসালেমে যাত্রার মধ্য দিয়ে এই ইচ্ছিত দিলেন যে,

তিনি মৃত্যুবরণ করার জন্য ফেহুসালামে যাত্রা করছেন। কারণ ফেহুসালামেই সকল প্রকৃত্যদের শহীদ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাঁর কোয়ও এর ব্যতিক্রম হবে না।



যীশুর ফেহুসালামে প্রবেশ

মহাপৌরবে যীশুর ফেহুসালামে প্রবেশ

যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ফেহুসালামের দিকে এগিয়ে আসছেন। এই সময় নিম্নতর পর্বের যোগ দিতে বহু লোক ফেহুসালামে এসেছিল। তারা যখন শুনতে পেল যীশু ফেহুসালামে আসছেন তখন তাঁরা তাঁকে স্বাগতম জানাতে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে যীশুর শিষ্যেরা গ্রাম থেকে একটি গাধার বাঁতা এনে তাঁর শিঠের উপর নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। তারপর যীশুকে তাঁর উপর বসালেন।

বহু লোকও তখন তাদের নিজেদের গায়ের চাদর পঙ্খের উপর বিছিয়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ আবার ভালশালা কেটে এনে পঙ্খের উপর বিছিয়ে দিলেন। আর যীশুর সামনে ও পিছনে জনতা চিৎকার করে কলতে লাগল, “জয় জয়! প্রভুর নামে যিনি আসছেন, ধন্য তিনি ধন্য। আমাদের পিতৃপুত্র নাটদের যে রাজ্য এবার প্রতিষ্ঠিত হবে, ধন্য ধন্য সেই রাজ্য। আহা, উর্ধ্বলোকে উঠুক অরব্বনি।” এভাবে অরব্বের সাথে সাথে যীশু ফেহুসালামের মণিরে প্রবেশ করেন।

যেহুসালামে প্রবেশের তাৎপর্য

প্রভু যীশুকে অনেকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সবসময় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপন নগ্নী তাঁকে পরিব্রাজ্ঞপে কীভাবে গ্রহণ করে তা তিনি রাজার বেশে যেহুসালামে প্রবেশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। তিনি সাধারণ একটি গাখার পিঠে চড়ে দাউসের সন্তানরূপে যেহুসালামে প্রবেশ করেছেন। কারণ তাঁর রাজত্ব ব্যতিক্রমধর্মী। এই রাজত্ব তিনি তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের নিস্তার রহস্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন।

অনুসন্ধানমূলক কাজ: তপস্যাকালে কী কী ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ব্রিটভক্তরা ইস্টার বা পাস্কাপর্বের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ইস্টারের আনন্দ কীভাবে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে তার ভগ্ন একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

সূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রভু যীশুকে অনেকে _____ বানাতে চেয়েছিল।
২. যীশু যেহুসালামে গিয়েছেন _____ চড়ে।
৩. ঐশ্বরাজ্য এখন খুব _____।
৪. প্রচারকাজ শুরু করার জন্য _____ জন শিষ্যকে বেছে নেন।
৫. যীশু _____ দ্বারা পরীক্ষিত হন।

কাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পিতা ঈশ্বর নিজে	■ পরিব্রাজ্ঞের রহস্য
২. যে আমাকে দেখেছে	■ জয়গানে মুখর হয়েছিল
৩. যীশুর সম্পূর্ণ জীবনটাই	■ প্রকাশ করেছেন
৪. রাখালেরা যীশুর	■ স্বাধীন মানুষ
৫. আমরা হয়ে উঠেছি	■ সে পিতাকে দেখেছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু বাগীপ্রচারকালে কতবার নিজ মৃত্যুর কথা বলেছেন ?
 - ক. দুইবার
 - খ. তিনবার
 - গ. চারবার
 - ঘ. পাঁচবার

২. বীশু দীক্ষান্নান গ্রহণ করেছেন কী প্রকাশের জন্য ?

- ক. ঈশ্বরের পৌরব
- খ. স্বর্গদূতের মহিমা
- গ. পবিত্রাত্মার মহিমা
- ঘ. বোহনের পৌরব

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মকস্মল এলাকায় প্রচারকণ্ঠ সাক্ষ্যমন্ত গ্রহণের জন্য শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা ভালোমশ ন্যায়-অন্যায় ও মন পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারে। পুরোহিতগণ বছরে একবার দূরবর্তী গ্রামে পালকীয় কাজে যান। তখন হিমেলও সাক্ষ্যমন্ত গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হলে। পরে তাকে সাক্ষ্যমন্ত দিয়ে মঙলীর দ্বিত্ব করা হলো।

৩. হিমেল উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন সাক্ষ্যমন্ত গ্রহণ করেছে ?

- ক. পাপস্বীকার
- খ. কন্মুনিয়ন
- গ. দীক্ষান্নান
- ঘ. হস্ততর্পণ

৪. হিমেল উক্ত সাক্ষ্যমন্ত গ্রহণের ফলে লাভ করে –

- i. ঈশ্বরের অনুগ্রহ
- ii. নতুন জীবন
- iii. মঙলীর স্বীকৃতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

১. অনল একজন বাণীপ্রচারক। ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তার মনোযোগ একটু বেশি। ধর্মীয় যে কোনো কাজে অনল সবার আগে। প্রচারকাজ করতে গিয়ে মানুষের বিভিন্ন সমালোচনার সন্মুখীন হয়। মানুষের ঘৃণা, অপমান সবই সহ্য করে তার কাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ অনল খুব ভালোভাবে জানত যে ভালো কিছু করতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এমনকি আপনজনদের কাছেও অবহেলিত হতে হবে। ছোটবেলার ধর্মীয় শিক্ষা তাকে ঠিক ধাক্কাতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই সে আজও ঈশ্বরের বাধ্য থেকে একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠেছে।

ক. বীশুর জন্মের প্রথম সাক্ষী কারা ?

খ. বীশু কোন গোশালায় জন্ম নিয়েছেন ?

গ. অনল তার কাজে কার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনলকে কি জুড়ি ঈশ্বরের মহিমা লাভের উপযুক্ত বলে মনে কর ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে হুক্তি দাও।

২. প্রসিড একজন সমাজকর্মী। সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি সকলের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা এলাকার সবাই জানা। একসময় তাঁরই এক বন্ধু চক্কান্ত করে তার সততা যাচাই করার জন্য প্রসিডকে পরীক্ষা করে। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে বলে তিনি যেন সেবামূলক কাজ বন্ধ করেন। প্রসিড তাঁর বন্ধুর কথায় কোনো গুরুত্বই দেয়নি। বরং তিনি তাঁর সেবামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য অনেক কর্মী নিয়োগ দিলেন, যাতে তার অনুশিখিভিতে অন্যেরা সেবাকাজ চালিয়ে নিতে পারে।

ক. বীশু কার দ্বারা দীক্ষান্নাত হন ?

খ. একজন খ্রিষ্টভক্ত দীক্ষান্নানের মাধ্যমে কী হয়ে তঠেন ?

গ. বীশুর জীবনের কোন ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রসিড প্রলোভন থেকে জয়ী হয়েছেন ? বর্ণনা কর।

ঘ. বীশুর শিষ্যদের আহ্বান ও প্রসিডের কর্মীদের নিয়োগ- এ দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বীশু কেন দ্বৈতীয় মৃত্যুবরণ করেছিলেন ?
২. বীশুর মহিমা আমাদের কী করতে সাহায্য করে ?
৩. দীক্ষাপুরুষ যোহনের প্রচারের মূল বিষয় কী ছিল ?
৪. বীশুর দীক্ষান্নানের সময় কোন বাণীটি শোনা গেল ?
৫. বীশু কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দীক্ষাপুরুষ যোহন কর্তৃক বীশুর দীক্ষান্নানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।
২. বীশু কেন ঘেরুসালেমে গিয়েছিলেন ?
৩. বীশুর ঘেরুসালেমে প্রবেশের ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা কর।

বঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান

মানুষ পাপ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও মানুষের জন্য ঈশ্বরের সীমাহীন ভালোবাসা একটুও কমে যায়নি। তিনি মানুষকে কথা দিলেন যে, তিনি একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠাবেন। ঈশ্বরের এই পরিবন্ধনা বাস্তবায়নে মারীয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঈশ্বরের আহ্বানে মারীয়ার সাড়াদান আমাদের জীবনের জন্য অনুপ্রেরণাস্বরূপ। আমরা অন্তরের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে এই অধ্যায়টি পাঠ করব এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি করতে ও সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করব।



মারীয়ার কাছে দূতের সবেল

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মারীয়ার কাছে মহানুভূত গভীরত্বের সবেল দানের কথা বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রিস্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করতে পারব।
- খ্রিস্টমন্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান নির্ণয় করতে পারব।
- ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: মারীয়ার কাছে মনহূত গব্রিয়েলের সংবাদ দান

মানবজাতির পতন ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি থেকেই শুরু হয়েছে মুক্তির পরিকল্পনা। সাপের বেশ ধরে আসা শয়তানকে ঈশ্বর বলেছিলেন: “তোমার ও নারীর বংশের মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে আমি এক শত্রুতা আনিবে তুলব; তার বংশের মানুষ তোমার মাথার আঘাত হানবে আর তুমি তাদের পায়ের গোড়ালিতে ছোঁল মারবে।” এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে এক নারীর কথা ও তাঁর বংশের কথা উল্লেখ আছে।

মারীয়া ছিলেন নাজারের এক কুমারী কন্যা। জাতিতে তিনি ছিলেন ইহুদি। তাঁর বাবা ছিলেন যোয়াকিম এবং মা আন্না। জন্মের পূর্ব থেকেই মারীয়াকে তাঁর বাবা ও মা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন। আর ঈশ্বর তাঁর পুত্রের জন্মদী হবার জন্য মারীয়াকে নিষ্কাশ অবস্থায় পৃথিবীতে এনেছিলেন।

একদিন ঈশ্বর মারীয়ার কাছে স্বর্ণদূত গব্রিয়েলকে পাঠালেন। মারীয়া ছিলেন যোসেফ নামক দাউদ বংশীয় একজনের বালদস্তা বধু। স্বর্ণদূত তাঁর কাছে এসে কলেন: “প্রণাম মারীয়া! পরম আশিসধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন।” এই কথা শুনে মারীয়া হুঁব কিলিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এমন সম্ভবপের অর্থ কী? স্বর্ণদূত তখন মারীয়াকে কলেন: “ভয় পেয়ে না, মারীয়া। তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করছে। শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুত্র দাউদের সিংহাসন। যাকোব-বংশের গুপ্তর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব।”

মারীয়া তখন দূতকে কলেন: “তা কী করে হবে? আমি যে কুমারী!” উত্তরে দূতটি কলেন: “পবিত্র আত্মা এসে তোমার গুপ্ত অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের সন্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই বীর জন্ম হবে, সেই পবিত্রজন্ম ঈশ্বরের পুর বলেই পরিচিত হবেন। . . . আর দেখ, তোমার আত্মীয় এলিজাবেথ, সে-ও বৃদ্ধবয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে। লোক যাকে কন্যা বলে ডাকত, তাঁরই এখন ছয় মাস চলেছে। কারণ ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।” মারীয়া তখন কলেন: “আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক।” (লুক:১:২৬-৩৮)।

কল্প: মারীয়ার কাছে দূত-সংবাদের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাও। অভিনয় শেষে দূতের কন্যা প্রার্থনাটি একসঙ্গে কল।

বাইবেলের এই অংশটুকু পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই স্বর্ণদূতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মারীয়ার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠালেন। মুক্তিসাত্র মা হবার জন্য তিনি মারীয়াকে আহ্বান জানান। আর মারীয়া প্রথমে বিচলিত হলেও ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেই গিয়েছিলেন। তিনি কলেন, “আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক।”

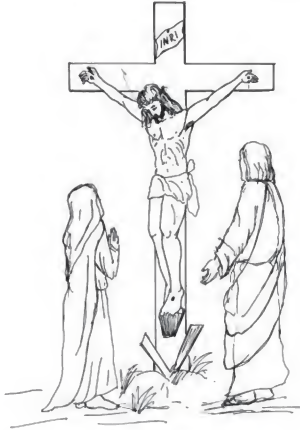
নাজারের কুমারী কন্যা মারীয়া অতি সাধারণভাবেই জীবন যাপন করছিলেন। আর দশটি সাধারণ মেয়ের মতোই মারীয়া যোসেফকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখছিলেন। কর্তন যোসেফের সাথে তাঁর বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল। মারীয়া ও যোসেফের মধ্যে বাল্যদান হয়েছিল। আর ঠিক সেই সময় দূতের এই সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তারপর অবিহিত অবস্থায় সন্তান গর্ভে ধারণ করার বিষয়টিও যে সম্ভব তা নিয়েও মারীয়া গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলেন। কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি ছিলেন অতি পবিত্র, ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত নারী। ঈশ্বরের যে-কোনো ইচ্ছা পালনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও উন্মুক্ত। নিজেকে তিনি ঈশ্বরের দাসী বলেছেন। স্বর্ণদূত যখন তাঁকে কলেন যে ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব, তখন মারীয়া তাঁর জীবনে ঈশ্বরের যে-কোনো ঘটনাই ঘটতে দিতে রাজি হলেন। এতে তাঁর কী হবে, সমাজের লোকেরা কী ভাবে বা কাকে এ ধরনের কোনো বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি। তাঁর পুরো জীবন নিয়ে তিনি শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবেন এটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

কল্প: তোমার জীবনে তুমি কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন কর তা দলের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২: খ্রিষ্ট ও মারীয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

খ্রিষ্টের সন্তো মারীয়ার সম্পর্ক কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ মারীয়া প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বর ও মুক্তিদাতার মা। আমরাও তাঁকে এভাবে স্বীকৃতি দেই ও সম্মান করি। যে কারণে খ্রিষ্ট ও মারীয়ার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ঠিক সেই কারণেই খ্রিষ্টমন্ডলীর সন্তো মারীয়ার কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানবজাতির পরিত্রাণকাজে পুত্রের সন্তো মাতার একান্ততা ছিল। এই একান্ততা কুমারীর গর্ভে বীশুর আগমন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে।

- ১। অনুগৃহীতা: প্রভুর আগমনবার্তা ঘোষণার সময় মহাসূত গভ্রিয়েল তাঁকে ‘অনুগৃহীতা’ বলে সম্বোধন জানিয়েছিলেন। এই বিশেষ সময় মারীয়া যেন তাঁর বিশ্বাসের গুণে ঈশ্বরের আস্থানে সাড়া দিতে পারেন তার জন্য ‘অনুগ্রহে পূর্ণ’ হওয়া খুব দরকার ছিল। মারীয়া আশিসধন্যা হয়েছেন ও তাঁর পবিত্রতা এসেছে সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টের কাছ থেকে। “খ্রিষ্টের পুণ্য ফলে তিনি এক মহত্তর উপায়ে পরিত্রাণ লাভ করেছেন।”
- ২। স্বাভাবিকতা: স্বর্গদূত মারীয়াকে বলেছিলেন যে পবিত্র আশ্রয় শক্তিতে তিনি একটি পুত্রের জন্য সেন। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব মনে হলেও মারীয়া বিশ্বাসপূর্ণ বাধ্যতা সহকারে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানতেন যে “ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই।” বাধ্যতা ও নতুনের কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, “আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলছেন, আমার প্রতি তা-ই যত্নে।” এই সম্মতিদানের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরপুত্রের মা হয়েছিলেন। মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঐশ্বরীয় ইচ্ছাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। নিজ পুত্রের নিকট এবং তাঁর কাজে নিজেকে পরিস্ফুটভাবে সমর্পণ করেছেন। হবার অবাধ্যতার ফলে মানুষ পাশে কলুষিত হয়েছিল। কিন্তু মারীয়ার বিশ্বাস ও বাধ্যতার কারণে মানুষ পাপমুক্ত হয়েছে। হবার অবাধ্যতায় পৃথিবীতে এসেছিল মৃত্যু। কিন্তু মারীয়ার বাধ্যতায় পৃথিবীতে এসেছে জীবন। তিনি হয়ে উঠেছেন জীবিতদের মাতা। স্বয়ং বীশুর সাথে যুক্ত থেকেই তিনি বাধ্যতার এই ঐশপুণ লাভ করেছেন।
- ৩। মারীয়া বীশুকে অর্পণত এনেছেন: বীশুর জন্য মারীয়া পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন। মারীয়া বীশুকে গর্ভে ধারণ করলেন ও পৃথিবীর জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে উপহার দিলেন। ছোট বীশুকে তিনি বড় করে তুললেন, শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে সুবৃদ্ধি দান করলেন। মারীয়ার জীবনের সব আনন্দ-বেদনা বীশুকে ঘিরেই। বীশুর জন্য মারীয়া সাতটি শোক পেয়েছিলেন। এই সাতটি শোক ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মারীয়া বীশুর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তবে এই দুঃখ-শোকের মধ্য দিয়ে মারীয়ার মাতৃভূত স্বপ্নটি আরও সুন্দর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যা হিসেবেই মারীয়া সবসময় মন্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেন। এভাবে খ্রিষ্ট ও তাঁর মন্ডলীর সাথে মারীয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।
- ৪। মারীয়ার ঐশ্বর্য মাতৃভূত: পবিত্র বাইবেলে মারীয়াকে ‘বীশুর মাতা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র আশ্রয় অনুপ্রেরণায় এলিজাবেথ তাঁর পুত্রের জনেই মারীয়াকে ‘আমার প্রভুর মা’ বলে সম্বোধন করেছেন। মারীয়ার এই ঐশ্বর্য মাতৃভূতকে মন্ডলীও স্বীকার করে নিয়েছে: মারীয়া ঈশ্বরজননী। তিনি পরমেশ্বরের পুত্র, যিনি মানুষ হয়েছেন এবং যিনি নিজেই ঈশ্বর— তাঁর জননী হয়েছেন মারীয়া। মা ও পুত্রের চিরকালীন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কখনো বীশু ও মারীয়া আবশ্য।
- ৫। হৃদয়ের তলায় মারীয়া: মারীয়ার সাথে খ্রিষ্ট ও মন্ডলীর একান্ততা সবচেয়ে গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে বীশুর বহুপাভাষণের সময়। বীশু শত্রুদের হাতে সমর্পিত হলেন।



ক্ৰ্শ্ণের তলায় মারীয়া

তঁার কিয়ৎ হলো এবং তঁাকে ক্ৰ্শ্ণে মৃত্যুপদ পেত্তয়া হলো । এতে মারীয়া ভীষণভাবে আঘাত পেলেন । যীশুর কাঁধে অতি ভারী ক্ৰ্শ্ণ চাপিয়ে দেত্তয়া হলো । তিনি ক্ৰ্শ্ণ কাঁধে চললেন কলভেরির পথে । মারীয়াও তঁার সাথে চললেন । পথে তঁার প্রিয় পুত্রের সাথে দেখা হলো । যীশু কলভেরিতে পৌঁছলে তঁাকে ক্ৰ্শ্ণবিশ্ব করা হলো । মৃত্যুর পূর্বে যীশু তিন ঘন্টা ক্ৰ্শ্ণীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন । এই যন্ত্রণাকালে প্রায় সব শিষ্যেরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু যীশুর মা মারীয়া সাহস করে ক্ৰ্শ্ণের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন । মা হিসেবে সন্তানের এই মৃত্যুব্যস্ত্রণাকালে তঁার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ী ।

এভাবে মারীয়া তঁার বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় এগিয়ে গিয়েছেন । ক্ৰ্শ্ণীয় মৃত্যু পর্বত পুত্রের সাথে বিশ্বস্ততায় অটল ছিলেন । ঐশ পরিকল্পনা অনুসারে তিনি তঁার একমাত্র পুত্রের চরম যন্ত্রণার সময় পাশে ছিলেন । তিনি তঁার মাতৃহৃদয়ে পুত্রের যাতনার এ পতীরতা অনুভব করেছেন । মুক্তির কাছে এগিয়ে যেতে ভালোবাসাপূর্ণ সক্ষমি দিয়েছেন । যীশুও মৃত্যুর পূর্বে তঁার মাকে প্রিয় শিষ্যের মা হিসেবে দান করেছিলেন । ক্ৰ্শ্ণের তলায় মারীয়ার মাতৃহৃদের এক অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে । ক্ৰ্শ্ণের তলায় মারীয়ার মাতৃহৃদের তিনটি বিশেষ নিক আমরা লক্ষ করি । সেগুলো হলো: সাধারণ নারী ও মানুষ হিসেবে তঁার মানবিক মাতৃহৃ, ঈশ্বরপুত্রের জননী হিসেবে তঁার ঐশ মাতৃহৃ এবং বিশ্বাসের দৃষ্টিতে তঁার আধ্যাত্মিক মাতৃহৃ । আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মারীয়ার মাতৃহৃদের এক চরম প্রকাশ এই ক্ৰ্শ্ণের তলায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় । যীশু নিজেও মারীয়ার কাছ থেকে শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এই চরম যন্ত্রণা ভোগ করার জন্ত ।

যোহনের কাছে নিজেদের মাকে ভুলে দিয়ে মারীয়াকে তিনি বিশ্বের সকল মানুষ ও মানবজাতির মা করে দিয়েছেন। আর যোহনকে মারীয়ার পুত্র হিসেবে দান করে সমগ্র মানবজাতিকে দিয়েছেন সন্তানের অধিকার। যীশুর মৃত্যুর পূর্বে জ্বশের তলায় মা মারীয়ার উপস্থিতিতে মানবজাতির ইতিহাসের এই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটেছিল। আজ পর্বত মারীয়া আমাদের সবার দুঃখকেননার সময় একইভাবে আমাদের পাশে দাঁড়ান। আমাদের আশা দেন, শক্তি ও সাহস বোণান জীবনের পথে এগিয়ে যাবার জন্য। কঠিন কাজ সম্পন্ন করার ও সকল বাধা অতিক্রম করার জন্য উপসাহিত করেন।

কাজ: তোমার জীবনের একটি ঘটনা সহতাপিতা কর, যখন তুমি মা মারীয়ার অনুশ্রেষণাদায়ী উপস্থিতি অনুভব করেছ।

৬. প্রাৰ্শনার মাধ্যমে মারীয়া খ্রিষ্ট ও মন্ডলীর সাথে সংযুক্ত: মারীয়া তাঁর পুত্রের স্বর্ণারোহণের পর প্রেরিতশিষ্যদের সাথে ছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে একাত্ম হয়ে প্রাৰ্শনার রত ছিলেন। এভাবে তিনি খ্রিষ্টমন্ডলীর ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছেন। সকলের সাথে প্রাৰ্শনার রত থেকে তিনি পবিত্র আত্মার অবতরণের অপেক্ষার ছিলেন। পবিত্র আত্মার প্রভাবেই মারীয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সব সময় মারীয়াকে ঘিরে ছিলেন।

৭. মারীয়ার কুমারীত্ব: মা মারীয়া ঈশ্বরপুত্রের জননী। কিন্তু খ্রিষ্টমন্ডলী প্রথম থেকেই একথা স্বীকার করেছে যে যীশু একমাত্র পবিত্র আত্মার শক্তিতেই কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। পবিত্র বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্ম এক ঐশ্বরিক কাজ। এ বিষয়টি মানুষের পক্ষে পুরোপুরি বুঝে ওঠা কঠিন। শ্রদ্ধে দৃঢ় হোসেফকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে, “মারীয়ার গর্ভে যা জনেছে তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে।” তাহাড়াতো খ্রিষ্টমন্ডলী মারীয়ার কুমারীত্বের ঐশ্বরিক প্রতিদ্বিত্বের পূর্ণতা দেখতে পেয়েছে। এ সম্পর্কে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে লেখা ছিল: “দেখ, যুভতিটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।” মারীয়ার ঈশ্বরপুত্রকে জন্মদান একটি রহস্যাবৃত্ত সত্য। তাই মন্ডলীর উপাসনায় মারীয়াকে সগর্বে ‘চিরকুমারী’ বলে ঘোষণা করা হয়।

৮. ঐশ্বরিককন্যার মারীয়ার কুমারী মাতৃত্ব: ঈশ্বর তাঁর মুক্তি পরিকল্পনায় চেয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র এক কুমারীর গর্ভে জন্ম নেন। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মারীয়া সেই মুক্তিপায়ী কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কুমারীত্ব হলো তাঁর বিশ্বাসের চিহ্ন। তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে তাঁর জাণকর্তার জননী হতে সাহায্য করেছে। “খ্রিষ্টের রক্তমাংসের দেহকে গর্ভে ধারণ করার জন্য মারীয়া ধন্য ঠিকই, কিন্তু তিনি আরও অধিক ধন্য, কেননা তিনি বিশ্বাসে খ্রিষ্টকে আঙ্গিলান করেছেন।” মারীয়া তাঁর মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছেন খ্রিষ্টমন্ডলীর প্রতীক। খ্রিষ্টের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়ে উঠেছে আরও দৃঢ়।

কাজ: যীশুর সাথে মারীয়ার সম্পর্ক তুমি ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে দেখে সেই অনুভূতি হেট দলে সহতাপিতা কর।

পাঠ ৩: খ্রিষ্টমন্ডলীর রহস্যে মারীয়ার স্থান

মারীয়া খ্রিষ্টের মাতা এবং তিনি খ্রিষ্টমন্ডলীরও মাতা। খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মার রহস্যে কুমারী মারীয়ার ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। মন্ডলীর রহস্যেও কুমারী মারীয়ার ভূমিকাটি বিবেচনা করা হয়। মারীয়া ঈশ্বর জননী, মুক্তিপাতার জননী। তাই যীশুর সাথে জড়িত সবকিছুর সাথে তিনিও জড়িত। যীশু মন্ডলী স্থাপন করেছেন, তিনি মন্ডলীর মস্তক। মারীয়া যীশুর মা, তাই তিনি মন্ডলীরও মা। মন্ডলীর জন্মদানে মারীয়ারও ভূমিকা আছে। বিশেষভাবে মন্ডলীর জন্মদিন, পঞ্চাশতমী গর্ভের দিনে যখন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন তখন মা মারীয়া শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। আজ পর্বত মারীয়া মন্ডলীর মাতা হিসেবে সর্বদা মন্ডলীতে উপস্থিত আছেন।

- ১। ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি: খ্রিষ্টমন্ডলীতে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। খ্রিষ্টমন্ডলীর আদি থেকেই তিনি ঈশ্বরজননী বলেই সম্বোধিত হয়ে আসছেন। মন্ডলীর উপাসনায় মা মারীয়ার বিশেষ স্থান আছে। মারীয়ার পর্বলুসা পালন, রোজারী মালা প্রার্থনার প্রতি ভক্তি— এগুলো মা মারীয়ার প্রতি ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ। মন্ডলীর ভক্তজনদেরাও তাদের বিপদে-আপদে বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে মারের কাছে প্রার্থনা করে থাকে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর অনেক গির্জায় ও গ্রামে মা মারীয়ার নামে ও উদ্দেশ্যে নির্মিত ও নিবেদিত। মা মারীয়ার স্মরণে অনেক তীর্থস্থানও রয়েছে। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তজন মারের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে যায়। মারের প্রতি বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনেক আতর্ষ কাজ সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে। অপমালা প্রার্থনা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থনা।
- ২। মারীয়া: খ্রিষ্টমন্ডলীর অস্তিত্বকালের প্রতিকৃতি: ধন্যা কুমারী নিরুদল্কা। তাঁর সাথে মন্ডলী সংযুক্ত রয়েছে বলে মন্ডলীও পবিত্রতা অর্জন করেছে। এখানে কোনো দূত নেই। তথাপি এই মন্ডলীর বিশ্বাসীগণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পাপ জয় করা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য আত্মা চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই তারা তাদের দুটি মারীয়ার প্রতি নিবন্ধ রেখে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ মারীয়ার মধ্যে খ্রিষ্টমন্ডলী ইতিমধ্যেই সর্বব্যাপী।
- ৩। মারীয়া হলেন খ্রিষ্টমন্ডলীর বাস্তব হৃদয়: মারীয়া হচ্ছেন কুমারী। তাঁর কুমারীত্ব হচ্ছে তাঁর বিশ্বাসের চিহ্ন। এই বিশ্বাসের মধ্যে সম্পদেহের কোনো স্থানই নেই। এই বিশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে তাঁর অশঙ্ক আত্মদানের প্রতীক। তাঁর বিশ্বাসই তাকে ত্রাণকর্তার জননী হতে সক্ষম করেছে। সাধু অগাস্টিন বলেন, “খ্রিষ্টের রক্তমাংসের দেহকে গর্ভে ধারণ করার জন্য মারীয়া ঠিকই ধন্যা, কিন্তু তিনি আরও অধিক ধন্যা, কেননা তিনি বিশ্বাসে খ্রিষ্টকে আলিঙ্গন করেছেন।” মারীয়া একই সময়ে কুমারী ও মা হয়ে, খ্রিষ্টমন্ডলীর প্রতীক হয়েছেন। খ্রিষ্টমন্ডলী সত্যিকারে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐশ্বর্যবাহীকে গ্রহণ করে প্রকৃত মা হয়ে ওঠে। বাপীক্কার ও দীক্ষাস্নান প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি সন্তানদের জন্ম দেন। এই সন্তানগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং পরমেশ্বরের হাতে এক নতুন এবং অবিনশ্বর জীবনে জনশ্রাব্য করে। তিনি নিজেই সেই কুমারী, যিনি তাঁর বরের কাছে নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসে রক্ষা করেন।

কাজ: ভূমি কীভাবে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি নিবেদন করে থাকে, তা দলে সহভাগিতা কর।

পালন করি

আমার এ প্রাণ পরম প্রভুর মহিমা গায়।

ছলয় ভরে মোর ত্রাণকর্তার প্রেরণায়।।

এই মীনা দাসীকে ধন্যা করিলে, অসীম আল্প ছলয়ে দিলে।।

পবিত্রকে তিনি করেন লজ্জানত, শক্তিমান সন্ত্রাট হয় পরাভিত।

দীনাগণ হয় সমাচ্ছে মহান, যুগে যুগে প্রভু ন্যায়বান।।

অনুশীলনী

স্থানস্থান পূরণ কর

১. মা মারীয়ার স্বরণে অনেক _____ শু রয়েছে।
২. মারীয়া খ্রিষ্টের _____ একে তিনি খ্রিষ্টমন্ডলীর মাতা।
৩. _____ মারীয়ার কাছে যীশুর জন্মের সর্বোদ প্রদান করেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মারীয়ার মা-বাবা	■ হিল গভীর আশ্বা ও বিশ্বাস
২. ঈশ্বরের প্রতি তাঁর	■ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও উন্মুক্ত
৩. পাত্রিলে মারীয়াকে	■ বোয়াকিম ও আদ্রা
৪. ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে মারীয়া ছিলেন	■ একটি রহস্যবৃত্ত সত্য
৫. মারীয়ার ঈশ্বরপুত্রকে জন্মদান	■ অনুগৃহীতা বলে সম্মান করতেন

ছবি নির্বাচন প্রশ্ন

১. কে মারীয়ার কাছে যীশুর জন্মের সর্বোদ নিয়েছিলেন ?

ক. ঈশ্বর

খ. অর্পদুত

গ. পবিত্র আত্মা

ঘ. মহাদুত মিখায়েল

২. ঈশ্বর কেন মারীয়াকে বেছে নিয়েছিলেন ?

ক. মারীয়ার মহত্তার জন্য

খ. মারীয়ার প্রার্থনাশীলতার জন্য

গ. মারীয়ার পবিত্রতার জন্য

ঘ. মারীয়ার সরলতার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ বন্ধের প্রশ্নের উত্তর দাও

ফ্রান্সা খুব ধার্মিক ও মীতিবান। তার একমাত্র সন্তানটি মানসিক প্রতিকর্ষী। সর্বদা ফ্রান্সা তার সন্তানটির যত্ন নিতেন ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। এক সময় তার এই প্রতিকর্ষী সন্তানটি একজন প্রথম সারির চিত্রকর হয়। দেশ-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

- ৩। ফ্রান্সার মধ্যে কুমারী মারীয়ার যে গুণটি প্রকাশ পায় তা হলো ঈশ্বরের প্রতি –

ক. নির্ভরশীলতা

খ. গভীর বিশ্বাস

গ. ভাসোবাসা

ঘ. তত্ত্ব

৪. স্লেয়ার এই চারিত্রিক গুণ মানুষকে দিতে পারে —

- i. ভালোবাসা
- ii. পৃথিবীতে শান্তি
- iii. পাপ থেকে মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. iii |
| গ. ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শান্তা সন্তম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সে ধার্মিক, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। ইস্টার উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে অনুষ্ঠান হয়, এতে সায়িত্ব পড়ে শান্তার। অনুষ্ঠানের দিনে কিছু বখাটে ছেলে অনুষ্ঠানটিকে ঋণিত করার জন্য পোশাযোগ করে। অনেক অশ্লীলবক্তারী পালিয়ে যায়। শান্তা কিন্তু প্রধান শিক্ষকের নির্দেশের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠানটির পর্ব চালিয়ে যায়। এ সময় তার পাশে থেকে বাংলা শিক্ষক তাকে সহযোগিতা করেন, সাহস দেন। এই সময় শান্তার কুমারী মারীয়ার কথা মনে পড়ে।

- ক. কুমারী মারীয়ার জীবন যাগন কেমন ছিল ?
- খ. আমরা কুমারী মারীয়ার প্রতি কীভাবে ভক্তি প্রদর্শন করতে পারি ?
- গ. শান্তার চরিত্রে কুমারী মারীয়ার কোন গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলা শিক্ষকের তুমিকার কারণে শান্তার এই সময়ে মারীয়ার কথা মনে হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মারীয়া জাতিতে কী ছিলেন ?
২. কুমারী কন্যা মারীয়া কেমন জীবনযাপন করেছিলেন ?
৩. ক্রুশের তলায় মারীয়ার কী লক্ষ্য করি ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাধ্যতা মারীয়ার বিশেষ গুণ-আলোচনা কর।
২. ‘মারীয়া আমাদের আশা দেন, শক্তি দেন’- বিশ্লেষণ কর।
৩. ‘খ্রিস্টমন্ডলীর অন্তিমকালের প্রতিকৃতি’-আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায় যীশুর আচর্য কাজ ও ঐশ্বরাজ্য

আমরা পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত প্রভু যীশু খ্রিষ্টের অনেক আচর্য ঘটনার কথা জানি। এই কাজগুলো তিনি তাঁর প্রচারজীবনে করেছেন। এই আচর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এগুলো হতো তাঁর ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রকাশ। শোকেরা এই কাজগুলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেত। কারণ তারা এধরনের কাজ এর আগে কখনো দেখেনি। এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশুর আচর্য কাজসমূহের কথা চিন্তা ও ধ্যান করে যীশুর ওপর আমাদের আস্থা আরও গভীর করে তুলব।



নিরাময়কারী যীশু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- যীশুর আচর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশ সন্সার্কে বর্ণনা করতে পারব।
- অপদূতসস্ত লোককে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশ সন্সার্কে বর্ণনা করতে পারব।
- যীশুর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখব ও ফলতার প্রভাব থেকে দূরে থাকব।

পাঠ - ১: যীশুর আচর্য কাজ ও ঐশ্বরাজ্য

আমরা আমরা যিহি, মার্জ, মুক ও যোহন লিখিত মকালসমচারে প্রভু যীশুর আচর্য কাজগুলোর কথা জেনেছি। আমরা খ্রিষ্টের আচর্য কাজের একটি তালিকা দেখতে পেরেছি। এ আচর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এ শক্তি বা ক্ষমতা মন্দতা বা অপশক্তির বিরুদ্ধে। মন্দতার বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই নতুন রাজ্যই হলো ঐশ্বরাজ্য।

ঐশ্বরাজ্য কী

আমরা রাজ্য বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে বুঝে থাকি যেখানে শাসনকর্তা ও প্রজা আছে। কিন্তু ঐশ্বরাজ্য জাগতিক কোনো রাজ্যের মতো নয়। এটি হলো ঈশ্বরের রাজ্য যেখানে কোনো পাপ বা মন্দতা নেই; বরং আছে ন্যায্যতা, শক্তি, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণগুলো। যেখানেই বা যে-কোনো ব্যক্তির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়, সেখানেই ঐশ্বরাজ্য বিরাজমান অর্থাৎ ঈশ্বর বিরাজমান। কাজেই কলা যায়, যেখানে ঈশ্বরের কর্মগুলো সাধিত হয় ও যারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো চলে তাদের মধ্যে ঐশ্বরাজ্য বিরাজমান। এটি বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন-উত্তর নিয়মেই পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে ঐশ্বরাজ্যের আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং তা ঈশ্বরপুর যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রভু যীশুর এই প্রকাশ তাঁর জীবন, তাঁর কথা ও তাঁর আচর্য কাজ দ্বারা সাধিত হয়েছে। এই রাজ্য শুধু খ্রিষ্টানদের কাছে নয় বরং সমস্ত মানবজাতির কাছে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জগতে খ্রিষ্টমন্ডলী হলো ঐশ্বরাজ্যের রাজ্য বা সূচনা। মন্ডলী সব সময় পরিণততার দিকে এগিয়ে চলেছে যার মধ্য দিয়ে ঐশ্বরাজ্যের পরিপূর্ণতা আসবে।

কাজ: পার্শ্ব রাজ্য ও ঐশ্বরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো পাশাপাশি দুইটি কলামে লেখ।

ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রভু যীশুর আহ্বান

প্রভু যীশু তাঁর প্রচারজীবন শুরু করেন ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশের আহ্বান জানিয়ে। নীচাপুরু যোহন কারাগারে বন্দী হওয়ার পর তিনি তাঁর সুসমাচার এই বলে ঘোষণা করেন, সময় পূর্ণ হয়েছে, ঐশ্বরাজ্য এখন খুব কাছে এসে গেছে। তোমরা মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর। প্রভু যীশু জগতে এসেছেন তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করে এই জগতে ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর পিতার ইচ্ছাই হচ্ছে, মানুষকে জীবন দান করা, বাতে মানুষ তাঁর ঐশ্বরাজ্যে সহযোগিতা করতে পারে। এই কারণে তিনি তাঁর চর্যাপাশের মানুষকে সমবেত করেন। তিনি তাঁর বাণীর দ্বারা, ঐশ্বরাজ্যের প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন চিহ্ন ও তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে মানুষকে তাঁর চর্যাপাশে সমবেত হতে আহ্বান করেন। সর্বোপরি প্রভু যীশু তাঁর জীবন মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যান।

প্রভু যীশু তাঁর ঐশ্বরাজ্যে সবাইকে আহ্বান করেন। যদিও ঐশ্বরাজ্যের কথা প্রথমে ঈশ্বরের প্রিয় জাতি ইসরায়েল সন্তানদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে, তথাপি তা সকল জাতির, সকল মানুষের জন্য। সবাই এই ঐশ্বরাজ্যের নাগরিক হতে আত্ম।

যদিও ঐশ্বরাজ্য সবার জন্য তথাপি এই রাজ্যে প্রবেশের বা এর নাগরিক হওয়ার অগ্রাধিকার পাবে দরিদ্র ও বিনম্ররা। যীশু নিজেই বলেছেন যারা অন্তরে সীন ধন্য তারা করণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। তাঁরা তাঁর বাণী বিনম্র অন্তরে শোনে, গ্রহণ করে ও সে অনুসারে জীবন যাপন করে। ঐশ্বরাজ্যের মর্মসত্য জাননী ও বুদ্ধিমানদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে নিতান্ত সীনতম ও ক্ষুদ্রতমদের কাছে। প্রভু যীশু তাঁর পার্শ্ব জীবনে সীনদরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাদের সাথে থেকেছেন, তাদের ভালোবাসে তাদের সমব্যবী হয়েছেন। সেই কারণে তিনি ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশের পূর্বশর্ত হিসেবে ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

তথাপি ঐশ্বরাজ্যের নাগরিক হওয়ার জন্য যীশু ঐশ্বরাজ্যকে একটি তোচ্ছসত্য সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর এই তোচ্ছসত্য তিনি পাণীদের নিমন্ত্রণ করেন। কারণ তিনি তো দারিদ্রদের জন্য এই জগতে আসেননি, এসেছেন পাণীদের

আহ্বান করতে। মন পরিবর্তন হলো ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথ। তাই একজন পাণীর মন পরিবর্তনে ঐশরাজ্যে কতই-না আনন্দ হয়।

ঐশরাজ্যের প্রতীকসমূহ

ঐশরাজ্যের রহস্য খুবই গভীর। এই কারণে বীশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্যের রহস্যকে বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও উপমা র যথ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেমন,

ক) বীশু ঐশরাজ্যকে সর্বে বীজের সাথে তুলনা করেছেন। বীশুর অঞ্চলের সর্বে গাছ অনেক বড়। বীজ হিসেবে তা খুবই ছোট। কিন্তু যখন চারা পড়ায় ও পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয় তখন কিন্তু অন্য সব গাছ সে ছাড়িয়ে যায়। পাকিয়াও এসে তাতে বাসা বাঁধতে পারে।

খ) ঐশরাজ্যকে বীশু ঝামিরের সাথেও তুলনা করেছেন। ঝামির ততক্ষণ পর্যন্ত মাথাতে হয় যতক্ষণ- না তা গৈজে চড়ে।



ঐশরাজ্য একটি কৃষ্ণের যতো

গ) বীশু ঐশরাজ্যকে আবার ঢুকিয়ে রাখা কোনো জমিতে গুণ্ডানের সাথে তুলনা করেছেন। কোনো লোক তা বীজে পেয়ে মনের আনন্দে গিয়ে তার যা-কিছু রয়েছে তা বিক্রি করে সেই জমিটা কিনে ফেলে।

বীশু তাঁর বিভিন্ন উপমার যথ্য দিয়ে সবাইকে ঐশরাজ্যে প্রবেশের আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তবে তা গ্রহণ করার জন্য প্রকৃত সিম্ধান্ত আমাদের। ঐশরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের কিছু ছাড়তে হবে এবং তার বাণী অনুসারে জীবন বাপন করতে হবে।

কাল: শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা কীভাবে ঐশরাজ্যের নাগরিক হতে পারি? দশে আলোচনা কর।

পাঠ - ২: আচর্য কাজের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশ

ঐশ্বরাজ্যের বিষয়টি আমাদের কাছে সঠিক করে তোলার জন্য যীশু খ্রিষ্ট তাঁর বাণীতে নানা উপমা ব্যবহার করেছেন। ঐশ্বরাজ্যের পূর্ণতা ও প্রকাশের জন্য তিনি বিভিন্ন আচর্য বা অশৌকিক কাজগুলোকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অশৌকিক কাজগুলোর মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে তিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন। এই কাজগুলো তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস আরও গভীর করতে সহায়তা করে। তাঁর এইসকল আচর্য কাজ তাঁর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এই জগতে ঐশ্বরাজ্যের আগমনের অর্থ হচ্ছে মন্দতা বা শরতানের পরাজয়। যীশু অপূত ত্যাগানের মধ্য দিয়ে মানুষকে মন্দ আচারের প্রভাব থেকে মুক্ত করেছেন। মন্দ আচার বিধ্বংসে জরুরি প্রবৃত্তি যীশু বিজয়ের পূর্বসূচক ঘোষণা করেছে। প্রবৃত্তি যীশুর রূপে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরাজ্যের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কাজ: প্রবৃত্তি যীশুর একটি আচর্য কাজ বেছে নাও। এর মধ্য দিয়ে কীভাবে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশ ঘটে এক কীভাবে যীশুর অশৌকিক কাজ করার ক্ষমতা প্রকাশ পায় তা খাতায় লেখ।

ঐশ্বরাজ্যের চাবি

ক্ষমতার বাহ্যিক চিহ্ন হলো চাবি। আমরা জানি, ঘর বা প্রতিষ্ঠানের চাবির দায়িত্ব থাকে-তাকে নেওয়া হয় না। যার সেই দায়িত্বভার রয়েছে বা যে তা বহন করতে পারবে তাকেই সে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

প্রবৃত্তি যীশু তার প্রচার জীবনে বারমর্মে মনোনিবেশ করেছেন যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকেন এবং তাঁর প্রেরণকর্তৃক অঙ্গসংগ্রহ করেন। বারোজনের অন্যতম ছিলেন পিতর, যাকে তিনি পাথর বলে অভিহিত করেছেন এবং এই পাথরের ভিতরে উপর তাঁর মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি তাঁর হাতে ঐশ্বরাজ্যের চাবি ভুলে দিয়েছেন। পৃথিবীতে তিনি যা মুক্ত করবেন, সর্বশেষ তা মুক্ত করা হবে। আর পৃথিবীতে তিনি যা-কিছু ধরে রাখবেন তা সর্বশেষ ধরে রাখা হবে। প্রবৃত্তি যীশু তাঁর মেঘবাদের পালন করার দায়িত্বও পিতরকে দিলেন। পিতরের হাতে ঐশ্বরাজ্যের চাবি প্রদান করা ও তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে পোপের দায়িত্ব পালনের কাজ ঐশ্বরাজ্যের উপস্থিতির চিহ্নই আমাদের কাছে আজও প্রকাশ করে।

পাঠ ৩: অপদূতত্বকে সুস্থতা দান

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুইটি দিকেরই প্রভাব রয়েছে। কখনো কখনো ভালো শক্তিটা প্রকাশ পায় আবার কখনো কখনো প্রকাশ পায় উঠে মন্দ শক্তিটা। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীতে সুভাষিত্ব ও অপশক্তি- এই দুইটিরই প্রভাব রয়েছে। কখনো কখনো আমরা সেবি সুভাষিত্ব খুব জোরদার তুমিকা পালন করছে, আবার কখনো কখনো সেবি অপশক্তিটা বেন সব দখল করে নিয়েছে। মানুষ তার সুভাষিত্ব বা ভালো শক্তির গুণে পৃথিবী আরও সুন্দর করতে পারে। আবার মানুষই তার অপশক্তি বা মন্দ শক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীটা ধ্বংস করতে পারে। মন্দ শক্তির ধারক ও বাহক হলো শয়তান। এই মন্দ শক্তি পৃথিবীতে আদি থেকেই বিদ্যমান ছিল। যীশু অপশক্তির বিধ্বংসে লড়াই করে তাকে পরাজিত করেছেন। আজও মানুষের মধ্যে সুভাষিত্ব ও অপশক্তির মধ্যে লড়াই চলছে।

কাজ: বাস্তব জগতে কোথায় কোথায় মন্দ শক্তি সক্রিয় এবং কী কী উপায়ে মন্দ শক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায় দলে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দূত ও অপদূত

প্রবৃত্তি যীশু খ্রিষ্ট অনেক অপদূত বিতাড়িত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে যমের ওপর তাঁর জয়লাভের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলে প্রবৃত্তি যীশু খ্রিষ্ট কর্তৃক অপদূত বিতাড়নের বিষয়ে আশোচনার পূর্বে দূত ও অপদূত সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি, দূতসের শুল্ক আত্মা আছে কিন্তু তাদের শরীর নেই। সর্বশেষ তিরিকাল ঈশ্বরের আরাধনা ও সেবা করতে ও তাঁর দর্শনসুখ ভোগ করতে ঈশ্বর সেবকদূতসের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। ঈশ্বর তাঁর প্রয়োজনে তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য দূতসের ব্যবহার করেছেন। যেমন যীশুর জন্মসংবাদ সেতুয়ার জন্য মহাপুত্র গাভীলকে প্রেরণ করেছেন। যীশুর জন্মের সংবাদ রাখাশদের কাছে সেতুয়ার জন্য দূতসের পাঠিয়েছেন। যীশুর শূন্য কবরে দূতেরা বসে ছিলেন এবং শিষ্যদের কাছে যীশুর পুনরুত্থানের বার্তা শুনিয়েছেন। এছাড়া আমাদের রক্ষা করার জন্যও ঈশ্বর রক্ষাদূতসের নিযুক্ত করেছেন। তাঁরা প্রতিদিন আমাদের রক্ষা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে অপদূতদেরও শূণ্য আশ্রা আছে, তাদের কোনো শরীর নেই। তারাও অনেক শক্তিশালী কিন্তু তাদের শক্তি সীমাহীন নয়। বিশ্বের রাজ্যগঠনে প্রতিহত করাই অপদূতদের প্রধান কাজ। অপদূতেরা এই জগতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বটে, কিন্তু বিশ্বের শক্তির কাছে তা কিছুই নয়। একজন মানুষ মন্দ আত্মার দ্বারা ভাঙিত হয় যখন সে শয়তানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই জগতে শয়তানের কাজ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পায়। এমনও হতে পারে যে একজন লোক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শয়তানের হাতিয়ার হয়ে পড়ে।

কাজ: দূত ও অপদূতদের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় কর।

বীশু অপদূত তালিকা

বাইবেলের বিভিন্ন মজলসমচার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রভু বীশু খ্রিষ্ট আট বার অপদূতগণ্ড লোককে নিরাময় করেছেন। নিম্নে এর তালিকা তুলে ধরা হলো:

- ১। অপদূতে পাওয়া অশ্ব ও বোবা লোকটি (মথি ১২: ২২-২৮; মার্ক ৩: ২২-২৭; লুক ১১: ১৪-২৩)
- ২। অপদূতে পাওয়া কানানীয় স্ত্রীলোকের মেয়েটি (মথি ১৫: ২১-২৮; মার্ক ৭: ২৪-৩০)
- ৩। অপদূতে পাওয়া বোবা লোকটি (মথি ৯: ৩২-৩৩; লুক ১১: ১৪-১৫)
- ৪। অপদূতে পাওয়া মূগীরোগী ছেলেটি (১৭: ১৪-২০; মার্ক ১৪: ২৬; লুক ৯: ৩৭-৪৩)।
- ৫। অপদূতে পাওয়া পেরোসেনীয় লোকটি (মথি ৮: ২৮-৩৪; মার্ক ৫: ১-২০; লুক ৮: ২৬-৩৯)।
- ৬। ককানিউম/ককরনান্দ্রুম সমাজপুর্বে অপদূতে পাওয়া একজন লোক (মথি ৭: ২৮-২৯; মার্ক ১: ২৩-২৮; লুক ৪: ৩১-৩৭)।
- ৭। মাপসালায় মারীয়া (মার্ক ১৬: ৯; যোহন ২০: ১১-১৮)।
- ৮। অপদূতে পাওয়া নূয়ে গড়া স্ত্রীলোকটি (লুক ১৩: ১০-১৭)।

কাজ: বীশু অপদূতগণ্ড লোকদের সুস্থ করার ঘটনাপুস্তকের মধ্য থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অভিনয় করে দেখাবে।

ঐশ আশ্রায় শক্তিতেই শয়তানের শক্তি নশ

উপরে উল্লিখিত তালিকার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু বীশু খ্রিষ্ট অনেক অপদূতগণ্ড লোককে সুস্থ করেছেন। একবার প্রভু বীশুর কাছে অপদূতে পাওয়া একটি লোককে আনা হলো। লোকটি বোবা ও অশ্ব ছিল। বীশু লোকটিকে সুস্থ করে তুললেন। লোকটি যে সন্তোষ সন্তোষ কথা বলার ও দেখার শক্তি ফিরে পেয়েছে তা দেখে উপস্থিত সকলে বুঝে আচর্য হয়ে গেল। তারা সকলে বীশুর অজ্ঞানি করতে লাগল। কিন্তু করিন্থিয়া ভাতে খুলি না- হয়ে বলতে লাগল বীশু নাকি অপদূতরাজ বেরোলেবুদের শক্তিতে অপদূত ভাঙিয়ে কেঁড়ান। বীশু তাদের মনোভাব জানতেন। তাই তিনি তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, বিবাসে বিভক্ত রাজ্য খুব ভাঙাতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। ঠিক তেমনি শয়তান নিজে যদি শয়তানকে ভাঙিয়ে কেঁড়ায় তাহলে শয়তানেরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই বিবাসে বিভক্ত হয়ে যায়। তাহলে সে রাজ্য বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। তিনি করিন্থিদের আশ্রয় জিজ্ঞেস করেন, তাদের শিখরায় যখন অপদূত ভাঙায় তখন কর শক্তিতে তা করে? সেটা নিচয় শয়তানের শক্তিতে নয়! তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তাই প্রভু বীশুও করিন্থিদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। আমরা জানি, প্রভু বীশু স্বয়ং পরমাশ্রায় শক্তিতে অপদূত তালিকা এবং এর মধ্য দিয়ে যে মানুষের মাঝে ঐশ্বরাজ্যের প্রকাশ করে চলছেন তারই ইচ্ছায় তিনি তাদের দান করেন।

কাছেই দেখা যায়, প্রভু বীশু খ্রিষ্ট সমস্ত মন্দতার গুণের তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছেন স্বয়ং পরমপিতার কাছ থেকে পাওয়া শক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি মন্দতাকে নির্মূল করতে এ জগতে আসেননি বরং এসেছেন যেন মানুষ মন্দতার দাসে পরিণত না-হয়। মানুষ যেন মন্দতার বিরুদ্ধে সজাগ করে পরিচালনা বা মুক্তির স্রোত লাভ করতে পারে এ জগতে ঐশ্বরাজ্য প্রসারিত করার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। প্রভু বীশুর মধ্য দিয়েই আমরা ঐশ্বরাজ্যের সন্ধান পেরেছি।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মঙ্গলক্টির ধারক ও বাহক হলো _____।
২. লোকটি কোথা ও _____ ছিল।
৩. সকলে যীশুর _____ করতে লাগল।
৪. _____ হলো ঐশ্বর্য্যে প্রবেশের পথ।
৫. একজন পাপী মন ফিরাতে ঐশ্বর্য্যে কতই-না _____ হয়।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সবাই ঐশ্বর্য্যের	■ দরিদ্র ও বিনম্র
২. প্রভু যীশু জগতে এসেছেন	■ জীবন যাপন করতে হবে
৩. ঐশ্বর্য্যের নাগরিক হওয়ার আত্মিকার পাবে	■ নাগরিক হতে আহুত
৪. ঐশ্বর্য্যে যেন একটি	■ পিতার ইচ্ছা পালন করতে
৫. যীশুর বাণী অনুসারে	■ সর্বে বিচ্ছেদ মতো

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জগতে ঐশ্বর্য্যের অর্থ কী ?
ক. যীশুর পরাজয়
খ. শিষ্যদের পরাজয়
গ. শয়তানের পরাজয়
ঘ. মরীয়ার পরাজয়
২. কী কারণে ইশ্বর ঐশ্বর্য্যের রহস্য প্রকাশ করেছেন ?
ক. ন্যায়পরায়ণতার জন্য
খ. মন পরিবর্তনের জন্য
গ. ধার্মিকতার জন্য
ঘ. সত্যবাদিতার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

কণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করে আসছেন। বয়সের কারণে তার পক্ষে প্রতিষ্ঠানের কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি মনে করেন, সহকর্মীদের মধ্যে কমল এ কাজটি করার উপযুক্ত। কমল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিব-সুস্থবীদের সেবার নিয়োজিত।

৩. কমলের মধ্যে পিতরের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ?
ক. সেবাপরায়ণতা
খ. মানবতা
গ. সহযোগিতা
ঘ. দায়িত্বশীলতা

৪. কমলের সাথে পিতরের কাজের বৈসাদৃশ্য হলো –

- i. আর্চ-পীড়নের সেবা
- ii. বাণী প্রচার
- iii. আচার্য কাক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূচনশীল প্রশ্ন

১. মাইকেল মধুসূদনের একটি দেশে গিয়ে দেখতে পেল দেশটি খুব সুন্দর। রাজ্যটির প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সবই পরিকল্পিত বলে মনে করল। রাজ্যের পরিচালনার রাজ্যের জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছে। যে কোনো সমস্যা বা অসুবিধার রাজ্য তার জনগণের পাশে থেকে ব্যবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছেন। জনগণও রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্যকে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

- ক. করা ঐশ্বরাক্ষের নাগরিক হতে আহুত ?
- খ. ঐশ্বরাক্ষে প্রবেশ করতে হলে আমাদের কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে ?
- গ. মাইকেলের দেখা রাজ্যটির মধ্যে ঐশ্বরাক্ষের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে-ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মাইকেলের দেখা রাজ্য ও তোমার পাঠ্যসূত্রকের উল্লিখিত রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

২. বীনা ও রিটা দুইজনই মেধাবী এবং ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। পড়াশুনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। কিছুদিন পর দেখা গেল বীনা একটু অন্যরকম আচরণ করতে শুরু করল। সে নেশাগ্রস্ত বন্ধুদের সাথে মোলামোশা করতে করতে নিজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়াশুনা অবহেলা করতে শুরু করে। সে চাচ্ছে সম্পর্কে ফিরে আসতে, কিন্তু পারছে না। বীনার মধ্যে সং ও অসং শক্তির হুম্ব চলছে।

- ক. আমাদের রক্ষা করার জন্য ঐশ্বর কাদের নিযুক্ত করেছেন ?
- খ. কী কারণে ঐশ্বর সেবদূতদের সৃষ্টি করেছেন ?
- গ. কোন শক্তির প্রভাব বীনার মধ্যে বিদ্যমান- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'প্রভু বীপুর পথই বীনাকে তার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে'-উক্তিটির বর্ধিততা মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আচার্য কাকের মধ্য দিয়ে বীপুর কোন দিকটি প্রকাশ পায় ?
২. ঐশ্বরাক্ষ্য বলতে কী বুঝ ?
৩. ঐশ্বরাক্ষের রহস্যসমূহ কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ?

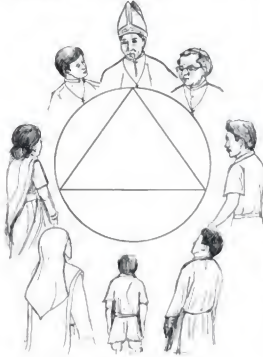
বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ভালো-মন্দ শক্তিসমূহের পার্থক্য নির্ণয় কর।
২. ঐশ্বরাক্ষ্য বোঝাতে বীণা কী ধরনের উপমা ব্যবহার করেছেন সতর্কপে আলোচনা কর।
৩. বীণা কর্তৃক অদপুত বিতাড়নের তিনটি ঘটনার নাম উল্লেখ করে যে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

খ্রিস্টমন্ডলী এক, পবিত্র ও শ্রৈরিক

খ্রিস্টমন্ডলীর একজন সক্রিয় সদস্যের খ্রিস্টমন্ডলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। আমাদের ভালো করে জানা দরকার যে, বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকলেও খ্রিস্টমন্ডলী মূলত এক ও সার্বজনীন। কারণ খ্রিষ্ট নিজেই এটি স্থাপন করেছেন। তিনি ঈশ্বর। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। তাই মন্ডলী পবিত্র। খ্রিষ্ট তাঁর শ্রৈরিকশিষ্যদেরকে সারা জগতের সকল মানুষের কাছে বাণীপ্রচার করতে প্রেরণ করেছেন। তাই মন্ডলী শ্রৈরিক। কাজেই এক এবং পবিত্র খ্রিস্টমন্ডলীর সদস্য হিসেবে আমরা সকলেই প্রেরণকর্মী। আমাদের সকলকেই এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। এই কারণে মন্ডলী সম্পর্কে আমাদের আরও উত্তমরূপে জানা দরকার।



খ্রিস্টমন্ডলীতে আমরা সকলে এক

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খ্রিস্টমন্ডলী বিষয়ভূক্তে ‘এক’ ও সার্বজনীন— এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারব।
- খ্রিস্টমন্ডলীর পবিত্রতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- খ্রিস্টমন্ডলীর শ্রৈরিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সমাজে একতা প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খ্রিস্টমন্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- ঐক্য, পবিত্রতা ও শ্রৈরিক সেবা কাজের মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করব।

পাঠ ১: খ্রীষ্টমন্ডলী এক

আমাদের প্রত্যেকের চেহারা, আচার-আচরণ, কথা বলার ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাথে অন্য এক ব্যক্তির কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও পুরোপুরি মিল ইচ্ছে পড়ায় যাবে না। একজন থেকে অন্যজন আলাদা হলেও আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ মিল আছে। মিলটা হলো এই যে, আমরা প্রত্যেকেই মানুষ। আমাদের সবার মধ্যেই রক্ত-মাংস আছে। আমাদের সবারই হাত-পা, নাক-কান, চোখমুখ ইত্যাদি আছে। আমরা সকলেই খাবাস থেকে অস্ত্রিভেজন নিয়ে বেঁচে থাকি। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক গ্রাস পানিকে আমরা তরল অবস্থায় দেখি, আবার দেখি বরফ হলে জমাটবাঁধা অবস্থায়। একই পানি গরম করে বাষ্প করে উড়িয়েও দিতে পারি। কাজেই পানিকে তরল, কঠিন ও বাষ্প-এই তিন অবস্থায় দেখলেও তিনটাই পানি। একইভাবে খ্রীষ্টমন্ডলীর মধ্যে আকারগত বা বৈশিষ্ট্যগত কিছু ভিন্নতা থাকলেও খ্রীষ্টমন্ডলী হিসেবে আমরা সবাই এক।

মানবজাতিকে তাঁর সাথে পুনর্মিলন এবং মানুষের সাথে মানুষের একতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছেন। খ্রীষ্ট চেয়েছেন, তিনি ও পিতা যেমন এক তেমনি সকল মানুষ যেন এক হয়। সকলেই যেন একই খ্রীষ্টীয় মিলনবন্ধন ও বিশ্বাসে একতাবদ্ধ থাকতে পারে। একতাবদ্ধ থাকার মধ্য দিয়েই খ্রীষ্টমন্ডলীর সকলেই যেন মন্ডলীকে প্রসারিত করার কাজে অংশগ্রহণ করে।

কাজ: বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বা মিল গড়ে তোলার জন্য কী কী প্রয়োজন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লেখ ও উপস্থাপন কর।

আমরা দলীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখলাম কোনো একটি দলের সদস্যদের একতাবদ্ধ থাকার জন্য কোন্ বিষয়গুলো বেশি প্রয়োজন। একইভাবে খ্রীষ্টমন্ডলী শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এক। এই একতা হুগে হুগে বিরাজ করবে।

নিম্নলিখিত কারণে খ্রীষ্টমন্ডলী এক:

১. প্রতিষ্ঠাতা: খ্রীষ্টমন্ডলী তার একমাত্র প্রতিষ্ঠাতার কারণে এক। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে মন্ডলীর সূচনা। প্রভু যীশু মন্ডলীর কর্তাধার। তিনি এই মন্ডলীকে পরিচালনার জন্য শক্তি, সাহস ও মনোবল প্রতিনিয়ত দান করছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় আমরা সবাই একতাবদ্ধ। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাই মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে পূরণ করেছেন। গড়ে তুলেছেন এক পবিত্র জনসমাজ।
২. আত্মা: খ্রীষ্টমন্ডলী তাঁর আত্মার কারণে এক। প্রভু যীশু খ্রিষ্ট পঞ্চাশতমী দিনে তাঁর মন্ডলীর ওপর আত্মাকে দান করেছেন। এক আত্মার কারণেই মন্ডলীর সূচনা থেকে জগতের শেষ অবধি মন্ডলী একতার সন্ধ্যানে পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। একই আত্মার আবেশে আবিষ্ট হয়ে খ্রীষ্টমন্ডলীতে আত্মিকভাবে সবাই একই মন্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
৩. ভালোবাসা: খ্রীষ্টমন্ডলী তাঁর ভালোবাসার কারণে এক। পিতা-ঈশ্বর ও পুত্র-ঈশ্বরের ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আত্মার প্রকাশ ঘটেছে এবং আত্মার বশবর্তী হয়েই মন্ডলীর জন্ম বা সূচনা। একই ভালোবাসা খ্রীষ্টভক্তগণ একে অপরের প্রতি প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ।
৪. বিশ্বাস, সাক্ষ্যমন্ত ও প্রেরিতিক উত্তরাধিকার: খ্রীষ্টমন্ডলী এক তার দৃশ্যমান মিলনবন্ধন বিশ্বাস, সত্যকার ও প্রেরিতিক উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টমন্ডলীতে বিশ্বাস এক। একই সৃষ্টিকর্তার আমরা বিশ্বাস করি। একই সত্যকারী অনুগ্রহে আমরা অনুগ্রহভাজন এবং পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে খ্রীষ্টভক্ত হিসেবে আমরা সবাই পরিচালিত।

কাজ: মন্ডলীতে ঐক্য থাকার প্রয়োজনীয়তা কেন তা দলে আলোচনার মাধ্যমে লেখ ও পরে সকলের সামনে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২: ব্রিটমডলী সার্বজনীন

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির কৃতি এবং আচার-অচারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মডলীর দিক থেকে ব্রিটভক্তগণ কখনো কখনো বিভিন্ন প্রটেক্টেট মডলীর অন্তর্ভুক্ত। তথাপি মডলীর সূচনা থেকে আমরা সবাই সার্বজনীন। সার্বজনীন কল্যাণকে অন্যকথায় বলা হয় কল্যাণিক। ব্রিট তাঁর অনুসারীদের মনোনিবেশ, নিযুক্ত ও প্রেরণ করেছেন সকল জাতির সকল মানুষের কাছে। তিনি বলেছেন তোমরা জগতের সর্বত্র যাও। সবার কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসম্প্রদায়। তিনি আরও বলেছেন মৃত্যুগোকারে কোনো নিক্তি মডলীকে কোনো পরাভূত করতে পারবে না। যীশু একথা বলেছেন, কারণ তিনি সবসময় পরপ্রদর্শক ও রক্ষাকর্তা হিসেবে মডলীর সাথে রয়েছেন। মডলীর সূচনাতে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষাভাষির উপস্থিতি মডলীর সার্বজনীনতার প্রকাশ যা বিরাট করবে ব্রিটের পুনরাগমন পর্যন্ত।

ব্রিটমডলী কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে সার্বজনীন হয়েছে। প্রভু যীশু ব্রিট নিজেই মডলী স্থাপন করেছেন এবং তাঁর মনোনিবেশ শিষ্যদের ওপর ন্যস্ত করেছেন। যীশু পিতরের নাম দিয়েছেন পাথর। এই পাথরের উপর তিনি তাঁর মডলী স্থাপন করেছেন। পিতরের সূত্র বিশ্বাসের ভিত্তির কারণে পিতরের ওপরই মডলীর দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। পিতরের উত্তরাধিকারী হিসেবে পরবর্তীতে অন্যান্য পোপগণ মডলীর দেখানুসার করার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ক্ষুদ্র মডলী ও বৃহত্তর মডলী— দুই-ই রোমের সাথে যুক্ত হয়ে সবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ভালোবাসা হলো প্রেরণকর্মের প্রেরণ। মডলী তার নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে ব্রিটের ভালোবাসা চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তাহাড়া একই ব্রিট যীশুতে বিশ্বাস ও সৎকারীরা সেবা দায়িত্ব আমাদের সার্বজনীনতা দান করে। মডলীতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মডলীর অবস্থান এবং কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন। তথাপি সব ব্রিটভক্তই একই ব্রিট যীশুতে দীক্ষিত। অনেক দিক দিয়ে সব মডলীর বিশ্বাসের অনেক মিল রয়েছে। সেই কারণে একা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সবসময় চলছে। এটা ব্রিটমডলীর জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ এতে যুক্ত হতে পারবে। মডলী সবার জন্য সেবার হাত বাড়িয়ে রেখেছে এবং সবার মাঝে ব্রিটীয় ভালোবাসা ও প্রেম বিস্তারিত দিচ্ছে।

কাজ: নিকটবর্তী একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যাবে ও সেখানে গিয়ে বাস্তবে সবার জন্য সেবাকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মডলীর সার্বজনীনতা প্রকাশ করবে।

পাঠ ৩: ব্রিটমডলী পবিত্র

পবিত্র বলতে বোঝায় বিশুদ্ধ বা ষাটি। এই কথার দ্বারা নিষ্কাশন বা পাপহীন এবং নির্ভল অবস্থাকেও বোঝায়। ঈশ্বরপুত্র যীশু ব্রিট পবিত্র মডলী স্থাপন করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। কারণ পিতা সকল মানুষকে পবিত্রতার পথে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে তাঁরই মতো পবিত্র করে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ পাপ দ্বারা সেই প্রতিমূর্তি অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্ব পবিত্রতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ঈশ্বর তাকে আবার সেই প্রতিমূর্তি অর্থাৎ পবিত্রতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। পুত্র এসে জীবন দিয়ে পবিত্রতা ফিরিয়ে এনেছেন। এই কাজটি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত যেন চলতে থাকে সেজন্যে তিনি একটি মডলী স্থাপন করেছেন। এই কারণে ব্রিটমডলী পবিত্র।

প্রভু যীশু ব্রিট নিজেই পবিত্র। তাঁর দ্বারা স্থাপিত মডলীও পবিত্র। তিনি মডলীকে পবিত্র আশ্রয় দানে ভূষিত করেছেন। মডলীকে তাঁর বহুরূপে ও তাঁর বহুরূপে তুলনা করে তাঁর পবিত্রতা দান করেছেন। তাঁদেরকে আপন করে নিয়েছেন। আত্মপ্রেম হচ্ছে পবিত্রতার প্রাণস্বরূপ বা অর্জন করার জন্য আমরা সবাই আহ্বান পেয়েছি। এই আত্মপ্রেম মডলীকে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করে, অর্ধপূর্ণ করে এবং পূর্ণতা দান করে।

আমাদের এই পৃথিবীটা একটা জমির মতো। এখানে ভালো কসপের গাছ ও পাশাপাশি আগাছা রয়েছে। আমাদের নিত্য মনে আছে যীশুর কথা সেই পমের দানা ও শ্যামাখাসের উপমা কাহিনীটি। ঐ পলটিতে যীশু বলেছেন, এক জমির মালিক

অমিতে গমের বীজ বুনেছেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে শব্দশূন্য সেই একই অমিতে শ্যামাখাস অর্থাৎ আগাছার বীজ বুনে দিয়েছে। গমের গাছ ও শ্যামাখাস দেখতে প্রায় একই রকম। তাই একই সাথে তারা বাড়তে লাগল। কিন্তু পার্থক্য কোথা গেল যখন তা পূর্ণভাবে বড় হলো, ঠিক ফসল ফলাবার আগে। মালিকের কর্মচারীরা আগে শ্যামাখাস তুলে ফেলতে চাইল। কিন্তু অমির মালিক তাতে রাজি হননি। কারণ তার ভয় ছিল, যদি শ্যামাখাস তুলতে গিয়ে তারা গমের গাছ তুলে ফেলে। তাই তিনি দুইটাকেই এক সাথে বাড়তে দিলেন।



হৃদয়ের পবিত্রতার সাথে মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতার সঙ্গ

এর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু বুঝিয়েছিলেন মালিক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, গম হলো ভালো লোক, শ্যামাখাস হলো মন্দ লোক, অমি হলো এই পৃথিবী, শব্দশূন্য হলো শয়তান। এই পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ লোকের সহ-অবস্থান। ঈশ্বর পাপীর ক্ষমদে চান না। কারণ তিনি চান পাপী মন পরিবর্তন করে তাঁর পথে ফিরে আসুক। তাই তিনি অপেক্ষা করেন, সময়-সুযোগ দান করেন।

সেখা যায় এই জগতে অনেকেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেই আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দান করেন। মন্ডলী তাদের স্বীকৃতি দান করার মাধ্যমে সাধু-সাধবীর মর্যাদা দান করেন। খ্রিষ্ট আমাদের সেই একই আহ্বান জানান যেন আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদেরকেও পবিত্র করে তুলতে পারি।

কাহ্ন: পবিত্র থাকার অর্থ এবং কীভাবে পবিত্র থাকার যার তা জোড়ার জোড়ার আলোচনা ও উপস্থাপন কর।

পাঠ ৪: খ্রিষ্টমন্ডলী শ্রৈষ্টিক

আমাদের মা-বাবা বা পুরুষদেরা আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন আয়শায় কাজের উদ্দেশ্যে পাঠান। আমাদের মা-বাবা আমাদেরকে বিশেষ এই কাজটি করার জন্য নিযুক্ত করেন এবং পাঠান। এই অর্থে আমরা শ্রৈষ্টিক।

খ্রিষ্টমন্ডলীও শুরু থেকে শ্রৈষ্টিক কাজের জন্য, শ্রৈষ্টিক হয়েছে কারণ খ্রিষ্ট নিজেই পিতার দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রৈষ্টিক হয়েছেন। তিনটি বিশেষ অর্থে আমরা খ্রিষ্টমন্ডলীকে শ্রৈষ্টিক কতে পারি:

- ১। খ্রিষ্টমন্ডলী শ্রৈষ্টিকদূতদের বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা সাক্ষ্যদানের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত এবং প্রেরণকর্তার জন্য শ্রৈষ্টিক।
- ২। আশ্রয় সহায়তার খ্রিষ্টমন্ডলী শ্রৈষ্টিকদূতদের মুখ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছে, তা সবদলে রক্ষা করে চলছে এবং মানুষের মাঝে তা পৌঁছে দিচ্ছে।

৩। বিশপ, বাজক ও পালকদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় পরিচালনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্রিটের পুনরাগমন পর্বত মন্ডলীকে শিক্ষাদান, পবিত্রীকরণ ও পরিচালনার কাজ চাঙ্গিয়ে যাচ্ছে।

প্রভু যীশু নিজে প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি একা একা কিছু করেন না। তিনি বলেন, নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না। পিতার কাছ থেকে যা পেয়েছি তাই প্রচার করি এবং অন্যকে সংযুক্ত করি। যীশু যেমন পিতা ছাড়া কিছু করতে পারেন না ঠিক তেমনি আমরাও প্রভু যীশুর শক্তি ছাড়া কিছুই করতে পারি না। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার জন্য আমরা সবাই আহুত, মনোনিত ও প্রেরিত।

কাজ: নিজ পরিবার, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজে তুমি কী কী প্রেরিতিক কাজ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

নূন্যস্থান পূরণ কর

১. সকল পবিত্রতার উৎস _____।
২. ব্রিটমন্ডলীর মধ্যে আকার ও বৈশিষ্ট্যগত তিনটা থাকলেও সবাই _____।
৩. শ্যামাধাস হলো _____ লোক।
৪. তিনিটি বিশেষ অর্থে আমরা ব্রিটমন্ডলীকে _____ বলতে পারি।
৫. তিনি চান পাপী _____ পরিবর্তন করে তাঁর পথে ফিরে আসুক।

বাম পাশের ব্যাক্যাণ্ডেশর সাথে ডান পাশের ব্যাক্যাণ্ডেশর মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ব্রিটমন্ডলী মূলত	■ কর্ণধার
২. প্রভু যীশু মন্ডলীর	■ এক ও সার্বজনীন
৩. ব্রিটমন্ডলীতে বিবাস	■ পাথর
৪. যীশু পিতরের নাম দিয়েছেন	■ এক
৫. ঈশ্বর মানুষকে তাঁর	■ আচার-অনুষ্ঠান তিন
	■ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল পবিত্রতার উৎস কে ?

ক. ঈশ্বর

খ. যীশু

গ. পবিত্র আত্মা

ঘ. স্বর্ণপুস্ত

২. মানুষ কীভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ ?

- ক. সেবার মাধ্যমে
- খ. ভালোবাসার মাধ্যমে
- গ. সহযোগিতার মাধ্যমে
- ঘ. বিশ্বাসের মাধ্যমে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিলন খ্রিস্টান সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। খ্রিস্টান সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে মিলনের প্রচেষ্টা এবং সমাজের লোকদের ভালোবাসা, একতা ও বিশ্বাসে পবিত্র সমাজ গড়ে উঠল।

৩. কার অনুপ্রেরণায় মিলন উক্ত কাজটি করতে উৎসাহিত হয়েছিলো ?

- ক. ফাদার
- খ. খ্রিস্টমন্ডলী
- গ. পবিত্র আত্মা
- ঘ. ধীনু খ্রিস্ট

৪. মিলনের কর্মকাণ্ডে সমাজে যে প্রভাব পড়বে তা হলো-

- i. প্রচেষ্টা
- ii. ভালোবাসা
- iii. বিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পুরোহিত রূপম মন্ডলীকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মন্ডলীকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি করে তুলেছেন। কিন্তু মন্ডলীর এক যুবক সীমান্ত পুরোহিতের অজান্তে অনেক খারাপ কাজ করে এবং মন্ডলীর কয়েকজন যুবককেও বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করে। মন্ডলীর সম্পাদক সীমান্তের এ কাজ বুঝতে পেরে পুরোহিতকে জানায় এবং মন্ডলী থেকে বের করে দিতে বলে। কিন্তু পুরোহিত বলেন, ‘না বের করার সরকার নেই। তার জন্য সুযোগ দান কর।’ ধীরে ধীরে তুল বুঝতে পেরে সীমান্ত সঠিক পথে ফিরে আসে।

- ক. পবিত্র বলতে কী বোঝায় ?
- খ. ঈশ্বরস্বর কোন পৃথিবীতে এসেছেন ?
- গ. পুরোহিতের কোন শিকায় সীমান্ত সঠিক পথে ফিরে আসে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সীমান্তের পবিত্র জীবনের ফলাফল কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর।

২. মাদার তেরেজা ছিলেন একজন ইউরোপীয় ও খ্রিষ্টান। কিন্তু বিশ্বের সকল দেশের সকল ধর্মের মানুষের জন্য তাঁর সেবা ও ভালোবাসা উনুস্ত। ধর্ম, দেশ ও জাতির ভিন্নতা বা পার্থক্য তিনি কোনো দিনও বিবেচনায় নেননি। তাঁকে অনুসরণকারী ভগ্নীদের নিয়ে তিনি গঠন করেন মানবসেবা সংঘ 'মিশনারিছ অব চ্যারিটি'। রাস্তায় পড়ে থাকা সহায়-সম্বলহীন মানুষের অশ্রুরের জন্য 'নির্মল হৃদয়' এতিম শিশুদের জন্য 'শিশু ভবন', মানসিক ও শারীরিক প্রতিকর্ষী শিশুদের জন্য 'নবজীবন আবাস' 'কুঠরোগীদের জন্য 'প্রেমনিবাস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অসীম মমতার সেবা দান করেন। তাঁর সৎদের ভগ্নীদের নিয়ে তিনি একতর জীবন গড়ে তুলে সকলের মাঝে দায়িত্ব দেন এবং নিজে আদর্শস্বরূপ কাঙ্ক্ষ করেন।

- ক. প্রেরণকর্মের প্রেরণা কী ?
- খ. খ্রিষ্টমন্ডলী কেন পবিত্র ?
- গ. মাদার তেরেজা কোন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে উপরের কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করেছিলেন ?
- ঘ. 'খ্রিষ্টমন্ডলী এবং মিশনারিছ অব চ্যারিটি' উভয়ই সার্বজনীন— উদ্দেশ্যক পাঠের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মন্ডলীর সূচনা হলো কীভাবে ?
২. খ্রিষ্টমন্ডলী কী কারণে পবিত্র ?
৩. কী অর্থে আমরা খ্রিষ্টমন্ডলীকে শ্রেণিতিক বলি ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. খ্রিষ্টমন্ডলীর শ্রেণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
২. কী কী কারণে খ্রিষ্টমন্ডলী এক ? ব্যাখ্যা কর।
৩. সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও বন্ধায় রাখতে খ্রিষ্টমন্ডলীর ভূমিকা বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

কমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম

কমা, সহনশীলতা ও দেশপ্রেম শূন্য সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ নয়, ধর্মীয় মূল্যবোধও বটে। কমার মনোভাব নিয়ে যে কোনো কাজ আমরা করব তা হবে উত্তম। সহনশীলতা আমাদের কাজে, চিন্তায় ও আচরণে পরিপক্বতা আনে। দেশপ্রেম মনের মাঝে ভালো কিছু করার ইচ্ছাকে আরও শক্তি বোগাবে।



কমা ও পুনর্মিলন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- কমা সম্পর্কে পকিয় বাইবেলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কমা করার সুফলগুলো বর্ণনা করতে পারব।
- কমা করা ও না-করার ফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহনশীলতা সম্পর্কে পকিয় বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- সামাজিক জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব।
- দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দেশপ্রেম সম্পর্কে পকিয় বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- কমানীল ও সহনশীল মানুষ হিসেবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবো।

পাঠ ১: কমা সম্পর্কে পকিয় বাইবেলের শিক্ষা

কম্ব: নিচের শাখাখণ্ডটি নিজ নিজ খাতায় লেখ এবং এক মিনিট নীরবে ধ্যান কর—এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কী কলতে চান।

“তোমরা একে অনেক প্রতি সন্মান হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে কমা করে নাও, যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের অন্তর দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের কমা করেছেন” (এফ ৪:৩২)।

নিজে কাউকে কমা করে থাকলে বা কেউ তোমাকে কোনো অপরাধের জন্য কমা করে থাকলে তা সলে অন্যদের সাথে সহযোগিতা কর।

এবার আমরা পর পর দুইটি ঘটনার বিবরণ শুনব এবং এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে আমরা কী করতাম তা নিজ নিজ খাতায় লিখব।

১। প্রথম ঘটনা

আদ্রা ও নমিতা খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। আদ্রা তার বান্ধবী নমিতাকে খুব বিশ্বাস করত। সে একবার নমিতার সাথে খুব গোপন একটি বিষয় আলোচন করল। সে মনে করেছিল, এই বিষয়টি নমিতা কারো সাথে আলোচন করবে না। কিন্তু নমিতা তা গোপন না-করেই অন্য একজন বান্ধবীর কাছে বলে দিল। নমিতা খুব আদ্রার কথাটাই বলেনি, একইসঙ্গে সে আরও কিছু কথা বানিয়ে বোল করে দিল। আদ্রা মনে খুব দুঃখ পেল কারণ তার বান্ধবী কথাটা গোপন রাখবে বলে যে কথা দিয়েছিল তা রাখেনি। এতে নমিতার ওপর তার অনেক রাগও হলো। মনে মনে সে কল, নমিতার সাথে সে আর কখনো কথা কবে না।

কম্ব: ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা কর: এরকম পরিস্থিতি তোমার নিজের হলে তুমি কী করতে তা তোমার খাতায় লেখ।

২। দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন রাসে শিক্ষক দলীয় আলোচনা দিলেন। দলীয় আলোচনার যাবার আগে সাগর তার হাতখড়িটা খুলে টেবিলের উপর রেখেছিল। দলীয় আলোচনার জন্য সে অন্য এক জায়গায় বসেছিল। তার দল থেকে নিজের জায়গায় এসে সে খড়িটা আর খুঁজে পেল না। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউই নিজেই বলে স্বীকার করল না। তাতে সাগরের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। পরদিন স্কুলে আসার আগে দীপ সাগরের বাড়িতে গেল। সে সাগরের কাছে স্বীকার করল যে সে-ই খড়িটা নিয়েছিল। এই বলে সে খড়িটা ফেরত দিল আর খুব অনুভূত চিন্তে কমা চাইল। সাগর খুব খুশি হয়ে কল, “তাই, তোমাকে আমি অবশ্যই কমা করি কারণ তুমি সাহস নিয়ে আমার কাছে এসে তোমার লোব স্বীকার করেছ এবং খড়িটা ফেরত দিছ। আমি কথা দিছি, আমি সবই তুলে যাব।” তারা আবার কল হয়ে গেল।

কম্ব: সাগরের স্থলে তুমি হলে তুমি কী করতে, প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় লেখ ও উপস্থাপন কর।

যুক্তিপাতা দীপ আমাদেরকে নিজের আদর্শ দিয়ে ক্রমার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এবার আমরা একটা শাস্ত্রালোচন শুনব। দীপ সমবেত লোকদেরকে কলেন: “তোমরা শুনবে যে, প্রাচীনকালের মানুষদেরকে এই কথা কলা হয়েছিল: ‘তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবালবে আর তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: ‘তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাস; যারা তোমাদের নির্ভাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর’ (মথি ৫:৪৩)।

দীপকে তাঁর শত্রুরা ধরে এনে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, বিনা সোবে সোধী সাবাস্ত করেছ, নিজেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এতেও দীপ কোনো কথা বলেননি। তাঁর মধ্যে প্রতিশোধের কোনো ভাব ছিল না। তিনি বৃহৎ এক হ্রদ বহন করে কালতেরি পর্বতের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর মুখে খুব সেওয়া হয়েছ, তাঁকে চড়, ঘুবি, লাথি ও চাবুক মারা হয়েছ। হ্রদে তাঁকে শেরের ঘারা বিশ্ব করা হয়েছ। তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে চাইলে শত্রুরা

টাকে সীকা খেতে দিয়েছে। ভবুও তিনি সব নীরবে সহ্য করেছেন। পিতার কাছে কান্ডর মিনতি জানিয়ে তিনি বলেছেন, “পিতা, ওদের ক্ষমা কর। ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না।” (লুক ২৩:৩৪)।

ইশ্বরের ক্ষমা পেতে চাইলে আমাদেরও একে অপসকে ক্ষমা করতে হবে

কাজ: দলে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর:

- ১। জুমি যদি কাউকে কোনোদিন ক্ষমা করে থাকে তা দলে অন্যদের সাথে সহযোগিতা কর।
- ২। কারও বিরুদ্ধে তোমার অন্তরে চাপা ক্ষোভ, রাগ বা প্রতিশোধের মনোভাব থাকলে তা জুমি কীভাবে জয় করতে পার এবং সত্যি সত্যি ক্ষমা করে দিতে পার?
- ৩। প্রার্থনা তোমাকে কীভাবে ক্ষমা করতে শেখাতে পারে?
- ৪। যীশু তোমাকে কীভাবে ক্ষমা করতে শেখাতে পারেন?

আমরা গাপ করলেও যদি অনুভব করে ক্ষমা চাই তবে আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের সকল গাপ ক্ষমা করে দেন। ইশ্বর যা একবার ক্ষমা করেন তা আর কখনো মনে আনেন না। আমরাও যখন কারো অপরাধ ক্ষমা করি তখন বেন আর তা মনে না-আনি।

নিচের শাখাপগুলো নিয়ে ধ্যান করি:

পিতার এগিয়ে এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন: “প্রভু, আমার তাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমার কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?” যীশু উত্তর দিলেন: “আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার” (মথি ১৮:২১-২২)।

“তোমরা একে অন্যের প্রতি সহ্য কর হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিষ্টে তোমাদের অশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন” (এফেসীয় ৪:৩২)।

উপরে যে দুইটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছি তা আবার স্মরণ করি। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে উত্তর আসে দিয়েছিলাম তা আবার চিন্তা করি। যদি আমার মন্তব্য পরিবর্তন করতে চাই তা এখন করতে পারি।

কাজ: নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা কর ও প্রতিবেদন প্রস্তুত কর:

- ১। আমি যদি আদ্যার স্থানে থাকতাম তবে নমিতার সাথে আমি কেমন আচরণ করতাম?
- ২। আদ্যা ও সাগর যদি সত্যিই অন্তর থেকে ক্ষমা করে থাকে তবে তাদের অন্তরে তখন কী রকম অনুভূতি হয়েছিল?

পার্শ্ব ২: ক্ষমা করার সুফল ও না করার কুফল

একটা করার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্ষমা করার ফল সবসময়ই ইতিবাচক এবং ক্ষমা না করার ফল সব সময়ই নেতিবাচক। প্রথমে আমরা দেখি ক্ষমা করার সুফলগুলো।

ক্ষমার সুফল

কারো বিরুদ্ধে আক্রোশের মনোভাব থাকলে তা ক্ষমা করে দিলে অন্তরে যেসব ভালো ফল পাওয়া যায় সেগুলো হলো:

- ১। অন্তরে শান্তি বিজ্ঞান করে, মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
- ২। মনের দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ বা অশান্তি, বৈরী মনোভাব কমে যায়।
- ৩। অন্যদের জন্য সহানুভূতি ও উদারতার জন্য হয়।
- ৪। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
- ৫। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি করা যায় অর্থাৎ ইশ্বরের সাথে সুন্দর সম্পর্ক পড়া সম্ভব হয়।

- ৬। রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।
- ৭। হতাশার ভাব কেটে যায়।
- ৮। কোনো রকম মাদকাসক্তির আশঙ্কা থাকে না।
- ৯। আদর্শবান মানুষ হিসেবে অন্যদের কাছে নিজেদের তুলে ধরা যায়।
- ১০। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।
- ১১। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে শান্তি ও আনন্দে ভরে তৈরি করা যায়।

কমা না করার কুসল

খুব মনোনিবেশ বা যাকে আমরা খুব বিশ্বাস করি এরকম কেউ যদি আমাদেরকে কোনোভাবে আঘাত দেয় তবে নিতাই আমরা খুব দুঃখ পাই ও রাগান্বিত হই। সেই রকম অনুভূতি যদি আমরা দিনের পর দিন মনের মধ্যে ধরে রাখি তবে আমাদের অন্তরে আক্রোশের মনোভাব বাসা বাঁধে।

- ১। আমরা ভবন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাই আর কৈরী মনোভাব গোষণ করি।
- ২। আমরা যদি আমাদের নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে বেশি বাড়তে দেই তবে সেগুলো আমাদের ইতিবাচক অনুভূতিগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর ভবন আমাদের মনে তিক্ততা ও অন্যায়তা সঞ্চারিত হয়ে ওঠে।
- ৩। যদি আমরা কমা করতে না চাই তবে আমরা নিজেরাই কণ্ডিত হই।
- ৪। কমা না করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মূল্য দিতে হয়। পরস্পরের সাথে আমাদের সম্পর্কে রাগের ভাব এসে যায়।
- ৫। আমরা মনের মধ্যে অতীতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ফলে বাস্তবের আনন্দগুলোকে আমরা ভোগ করতে পারি না।
- ৬। আমাদের মনে হতাশা কাজ করতে থাকে। ভবন আমাদের কাছে জীবনটা নিরানন্দ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।
- ৭। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের আর আকর্ষণ করে না। আমরা স্বর্গের পথ হারিয়ে ফেলি।
- ৮। অন্যদের সাথেও আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। আমরা একাকী হয়ে যাই।
- ৯। সকল কাজে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও সকলের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়।

কম: একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠান করা বেতে পারে। এতে করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কমা চাওয়া ও কমা দেওয়ার সুযোগ পাবে ও সকলেই কমার অভিজ্ঞতা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠ ৩: সহনশীলতা

সহনশীলতা অর্থ হচ্ছে নির্মম বা বিরক্তিকর অনুভূতি দমন করার সক্ষমতা বা ইচ্ছা। সহনশীলতা ঘরা শান্ত ও অটল অধ্যবসায়ও বোঝায়। সেই ব্যক্তিকেই আমরা সহনশীল বলি যিনি প্রয়োচনা, উসকানি, বিরক্তি, দুর্ঘটনা, ক্লেশ, কষ্টকর পরিস্থিতি, দুর্ভোগ, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি পরিস্থিতি সহ্য করতে পারেন। তিনি এগুলো সহ্য করতে পারেন সবেম ও ধৈর্য সহকারে।

আমরা জীবনে যা-কিছু করি প্রায় সবকিছুর জন্যই সহনশীলতা প্রয়োজন। আমরা প্রায়ই কোনো এক স্থানে রওনা দিয়ে যানজটে আটকা পড়ে যাই, ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে বা কোনো জায়গায় যাতায়াত টিকেট কাটার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এসব স্থানে রাগান্বিত বা চিৎকার করলেও কোনো লাভ হয় না। সেখানে সহনশীল মনোভাব নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি থাকে না।

সহনশীলতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা

সাধু পল বলেন: “আমরা যা সেবতে পাই না, তার আশা বন্ধন করি, তখন সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকি” (রোমীয় ৮:২৫)।

সাধু বালোকব বলেন: “মনে রেখো, ঈশ্বর নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছেন, তাঁদেরই আমরা ধন্য বলে থাকি। যোবের সেই নিষ্ঠাতার কথা তোমরা তো শুনছ; আর এ-ও দেখেছ যে, প্রভু এ ব্যাপারে শেষে ঐক্য করেছিলেন। তাঁর তো তা করারই কথা: প্রভু যে দয়াময়, কহুগনিধান!” (যাকোব ৫:১১)।

সাধু বালোকব যোবের উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা জানি যোব তাঁর সব সহায় সম্পত্তি, ছেলেমেয়ে, যত পণ্ডসম্পদ, এমনকি তাঁর সব অর্থকড়িও হারিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাবান্ধবেরা এসে তাঁকে নানারকম অসৎ উপদেশ দিয়েছেন। এধরনের সমস্ত পরীক্ষার যোব উত্তীর্ণ হয়েছেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে কোনোরকম পাপ করতে চাননি। যোবের গ্রন্থে বলা হয়েছে: “এত কিছু ঘটা সত্ত্বেও যোব এমন কিছুই করলেন না, যাতে পাপ হয়। ঈশ্বরের প্রতি নির্বোধের মতো কোনো অভিযোগও করলেন না তিনি” (যোব ১:২২)। যোবের স্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিলেন, যোব যেন ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন। তাই যোব স্ত্রীকে বলেছিলেন, “নির্বোধ মেয়েরা যেমন কথা বলে, তুমি তো সেইরকম কথা-ই কহ। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যেমন সুখ গ্রহণ করে থাকি, তেমনি দুঃখও কি গ্রহণ করব না?” (যোব ২:১০)।

সাধু পিতর বলেন: “আর তাই তো তোমাদের মনে এত আনন্দ, যদিও এখন কিছুকালের জন্য তোমাদের নানা পরীক্ষার দুঃখকষ্টও পেতে হচ্ছে, যাতে ঈশ্বরের গুণ তোমাদের বিশ্বাস যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়; এমন বিশ্বাস, সে তো নশ্বর স্বর্ণের চেয়ে অনেক মূল্যবান—যদিও স্বর্ণটা আগুনে যাচাই করা হয়। আর এমন বিশ্বাসই যীশু খ্রিষ্টের সেই মহা আত্মপ্রকাশের দিনে তোমাদের প্রশংসা, সম্মান ও মহিমার কারণ হয়ে পড়াবে” (১পিতর ১:৬-৭)।

প্রকট গ্রন্থে বলা হয়েছে: “অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব, এমন কথা কখনো বলা না; তুমি বরং ঈশ্বরের গুণেরই আস্থা রাখো, তোমাকে বিচাবেন তিনি” (প্রকট/হিতোপদেশ ২০:২২)।

সাধু পল বলেন: “সমস্ত নিষ্ঠা, সমস্ত আত্মাসের উৎস স্বয়ং পরমেশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, খ্রিষ্ট যীশুর আশ্রয় অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একত্র হতে পার” (রোমীয় ১৫:৫)। তিনি আরও বলেন, “শুধু তাই নয়: আমরা তো আমাদের দুঃখ-দুর্ভোগ নিয়েও গর্ব করে থাকি; কেন না আমরা জানি যে, দুঃখ-দুর্ভোগ থেকে আসে নিষ্ঠা আর নিষ্ঠা থেকে চারিত্রিক বোধ্যতা; আর চারিত্রিক বোধ্যতা থেকে অন্তরে জেগে ওঠে আশা” (রোমীয় ৫:৩-৪)।

সাধু বালোকব বলেন: “শোন, তাই, প্রভু যতদিন না-আসেন, ততদিন তোমরা বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা চাখির কথা একবার ভেবে দেখ, সে কেমন করে জমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষার বসে থাকে, তার জন্যে কেমন ধৈর্য ধরেই সে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ-না নেমে আসে প্রথম আর শেষ বর্ষার জল” (যাকোব ৫:৭)।

পার্শ্ব ৪: ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সহনশীলতা চর্চার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ হিসেবে আমাদের যত গুণ আছে তার মধ্যে প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে এই সহনশীলতা গুণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যীশু তাঁর শিষ্যদের কলেন, “কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক” (মথি ১৬:২৪)। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে একজন বিশ্বস্ত খ্রিষ্টভক্তের জীবনে নানারকম বিপদ আপদ, দুঃখ-বিস্ময়, অজ্ঞানতা ইত্যাদি আসবেই। যীশুর নামে সেগুলো সহ্য করতেই হবে। এগুলো তার জীবনে আসবে কারণ সে যীশুকে ভালোবাসে।

সহনশীলতা আসে একটি ল্যাটিন শব্দ *patiencia* থেকে, যার অর্থ ‘কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা’। অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা চাই বা না-চাই, আমাদের সহ্য করতেই হয়। যেমন রান্না বসিয়ে অপেক্ষা করা, গড়পড়ার জন্য

সময় সেওয়া, পরীক্ষার শিখে কলসের জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করা, ক্ষেত্রে কলস বুনে কয়েক মাস অপেক্ষা করা, রাস্তার বানজটে আটকে থাকা, টিকেট কটার জন্য কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি। এগুলোর জন্য সময় প্রয়োজন হয়। তাড়াতাড়ি করলে কলস ঠিকমতো হয় না। এছাড়া, ভিড়ের রাস্তার তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিরে আমাদের সহনশীল হতে হয়। যখন আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হয় বলে বাসে বা রিক্সার ভিড় আর বাসের ড্রাইভার বা রিক্সাওয়ালা যদি দ্রুত না-চালায় তবে আমরা অনেক সময় অপেক্ষা করে যাই। এসময়ও আমাদের সহনশীল হতে হয়।

সামাজিক মানুষ হিসেবে সহনশীলতার গুণটি চর্চা করে আমরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারি, যতে পারি অনেকের কাছে অনুকরণীয়। পরিবারে, বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে কণ্ঠস্বরের সাথে আচ্ছাদ্য-সব জরপাতে ও সব কাজে আমাদের সহনশীল হতে হবে।



লাইনে দাঁড়ানো

সামাজিক আচরণ-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সময় সহনশীলতা দেখাতে হবে। অনেকের মতামতকে স্থান দেওয়াতে হবে। বিশেষভাবে রাস্তার চলাচলের সময় অপরিস্রবিত কারো সাথে কথা বলার সময় আমাদের সংযত আচরণ করতে হবে, সহনশীল হতে হবে।

কখনো কখনো আমরা প্রার্থনা করে সাথে সাথে কল চাই। তখন আমাদের মনে রাখতেই হয়, ঈশ্বর যখন চাইবেন তখন আমরা চাওয়াটা পূরণ করবেন।

পার্ঠ ৫: সহনশীলতা অর্জনের উপায়

একটি প্রবাদবাক্য আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করে থাকি, “যে সহ্যে, সে রহে।” প্রবাদবাক্যটিতে সহনশীলতার জর যে সুনিশ্চিত তা বুঝানো হয়েছে। সহনশীলতা একটি অর্জনযোগ্য মানবিক গুণ। আমরা নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করলে সহনশীলতা অর্জন করতে পারি:

- ক) ঈশ্বরভক্ত মানুষ হিসেবে নিরমিত প্রার্থনা করে ও ঈশ্বরের পরিতালনা করিবন্ত থেকে।
- খ) সৈন্যপাল বাধ্যতালিকা ঠিক রেখে নিরমিত ধারার গ্রহণ ও পরিমিত বিশ্রাম নিয়ে।
- গ) মনের মধ্যে কোনো ধরনের রাগ ও হিংসা পোষণ না করে।
- ঘ) কোনো কাজে বা পরিশ্রমিত মানসিক চাল সৃষ্টি হলে তার ভারসাম্য করার রেখে মোকাবেলা করে।
- ঙ) কাজে জর পেশে ধ্যানাধ্য সাতাতিক আচরণ করে এবং পরাক্ষিত হলে তা মেনে নিয়ে।
- চ) মহামানবীরদের জীবন ও কাজ অনুসরণ করে।
- ছ) কোনো বিরোধের কারণে সম্পর্কের অবনতি হলে তা দ্রুত মিটিয়ে বেলে।
- জ) সমাজে অবহেলিত ও গরিব-দুখী মানুষের জন্য কাজ করে এবং সবসময় তাদের পাশে থেকে।
- ঝ) বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস ও প্রতিষ্ঠানে বেমন ব্যাক থেকে সেবা নিতে বা ট্রেনে কিংবা বাসে টিকিট কটার সময় লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা নিয়ে।
- ঞ) জীবনে দুখ-কষ্ট আসলে, কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হলে সন্নয় ও নম্র মন নিয়ে তা গ্রহণ করে আমরা সহনশীলতা অর্জন করতে পারি।

‘সবুবে যেওয়া কলে’ কথাটি প্রতিটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষা করা, ধৈর্য ধরা, সহনশীল হওয়া সবই বিজয়ী হওয়ার উপায়। আমরা জ্বনি বর্তমান গুণিহীতে নানা প্রতিদ্বন্দ্বতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধুছে। জীবনের যে-কোনো কাজে ও পরিশ্রমিত সহনশীল থেকে তা মোকাবেলা করে জরী হয়ে জীবনকে সাক্ষ্যনোর জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

পাঠ ৬: দেশপ্রেম

নিজ দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ বা ভালোবাসাকে দেশপ্রেম বলা হয়। দেশপ্রেমের সাথে জড়িত থাকে জাতীয়তাবোধ। প্রত্যেক দেশের মানুষের মধ্যেই দেশের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কলভাবা' কবিতায় দাবাসার কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

হে বলা ভাঙরে তব বিবিধ রতন:-
তা সবে, (বোঝো আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-পোতে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, তিফাবুত্তি কৃক্ষেণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সপি কার, যনয়,
মজিনু বিকল তপে অকরণ্যে বরি:-

কেলিনু শৈবালে, ছুপি কমল-কানন।
সব্ধে তব কুলস্বামী করে দিলা পরে,-
"তরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাশি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা কিরি, অজান ভুই, যা রে কিরি ঘরে।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাবা-হুণ বনি, পূর্ণ মণিআলো।

কণেরতাক নদ কবিতার মাইকেল মধুসূদন বলেন:

সতত, হে নদ, ছুঁই পড় মের মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেহাতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-বস্ত্রবসি) তব কলকলে

জুড়াই এ কান আমি আঙির হলনে!-
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-সলে,
কিন্তু এ স্নেহের ভূষা মিটে কার জলে?

ইংরেজ কবি সাধারণ জনগণ বলেছেন দেশপ্রেম কলতে বোঝায় 'দুরাচারী ব্যক্তির সর্বশেষ অপ্রিয়ম্বল'। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সব মানুষের এমনকি দুর্বৃত্ত বা দুরাচারী ধরনের ব্যক্তিরও একটা অপ্রিয়ম্বল দরকার। আর সেই অপ্রিয়ম্বল হলো তার মাতৃভূমি তার আপন দেশ।



রাষ্ট্রপ্রেমের মূর্তিবোধ

মা-মাটি-মাতৃভূমি এই তিন 'ম' যে কোনো মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় শব্দ। এই তিনকে ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম। দেশের মাটির ফসল, ফলমূল মানুষের জীবন বিচার, দেশের বন-বনানী ও প্রকৃতি পরম মমতায় উপরতাবে আমাদের প্রয়োজন যেটায়। তাইতো দেশের প্রতি আমাদের মনে মমতা সৃষ্টি হয়। দেশের প্রতি মমত্ববোধও দেশপ্রেম নিয়ে আমরা সব কাজ করব। তাই তো জাতীয় সঙ্গীতে আমরা গেয়ে উঠি:

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

পবিত্র ঝাইবেলে দেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষা

"বাসের হাতে রয়েছে শাসন করার অধিকার, সকলেই যেন তাঁদের অনুগত হয়ে থাকে, কেননা তেমন কর্তৃত্বের অধিকার মাত্রই আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। বাসের হাতে কর্তৃত্বের দায়িত্ব রয়েছে, তাঁরা তাঁর কাছ থেকেই তা পেয়েছেন। আর তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে কিছু স্বয়ং ইশ্বর যা স্থির করে রেখেছেন, তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা যারা করে, তারা নিজেরা নিজেরের ওপর শাস্তি ডেকে আনবেই। যারা ভালো কাজ করে, তাদের তো শাসকদের ভয় পাবার কোনো কারণই থাকে না। ভয় পাবার কারণ থাকে বরং তাদেরই, যারা মন্দ কাজ করে। কর্তৃপক্ষের কাটকে ভূমি ভয় পাবে না, ভূমি কি তেমনটি চাও? বেশ তো, যা ভালো, তাই কর। তাহলে ভূমি তো কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে। আসলে তাঁরা তো ইশ্বরেরই নিয়োজিত সেবাকর্মী— তোমার যত্নল করার জন্যেই নিয়োজিত তাঁরা। কিন্তু ভূমি যদি মন্দ কাজ কর, তাহলে তোমার ভয় পাবার কারণ অবশ্যই আছে। তাঁরা তো শুধু শুধু তলোয়ার সজো বয়ে নিয়ে বেড়ান না; তাঁরা তো ইশ্বরের সেবক: যারা মন্দ কাজ করে, তাদের ওপর ঐশ ক্রোধের আঘাত হানার দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে রয়েছে। সুতরাং তাঁদের প্রতি তোমাদের অনুগত হয়ে থাকতেই হবে—শুধুমাত্র ঐশ ক্রোধের আঘাতকে ভয় পাও বলেই নয়, কিংবাকৈ মান্য কর বলেই" (রোমীয় ১৩:১-৫)।

এর মধ্য দিয়ে সাধু পল আমাদের কাছে বলতে চান যে আমরা যেন শাসনকর্তাদের ভালোবাসার মাধ্যমে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করি। কারণ শাসকপল ইশ্বরেরই সেবক। কাজেই ভালোবাসা আছে বলে আমরা কোনো ভয় যেন না পাই। যারা মন্দ কাজ করে তাদের মধ্যে দেশের প্রতি ভালোবাসার অভাব আছে। তারা শাসকদেরও ভয় পায়।

সামসংগীত সেবক পিছেছেন:

ধন্য সেই জাতি, ইশ্বর যার আপন প্রভু;
ধন্য সেই জনসমাজ, যাকে নিছেরই জাতি-রূপে তিনি করেছেন মনোনীত।
ইশ্বর তো স্বর্গ থেকে ডাকিয়ে দেখেন;
সব মানুষকে দেখতেই পান তিনি।
সুবিদ্য রাক্ষবাহিনী রাজাকে বিচাতে পারে না;
যোদ্ধার মহা বাহুবলিও সেই যোদ্ধাকে রক্ষা করতে পারে না।
যুদ্ধ-অশ্ব সম্বল করে জয়ের আশা তো বৃথা;
সেই অশ্বের বত তেজ থাক, কাটকে বিচাতে পারে না।
ইশ্বরের দৃষ্টি কিন্তু নিয়ত তাদেরই প্রতি,
তাঁকে সন্তুষ্ট করে যারা,
তাঁরই কৃপা-প্রত্যাশী যারা।
তাদের তিনি তো মুক্তার হাত থেকে উদ্ধার করবেন,
প্রাণ বিচাবেন দৃষ্টিভঙ্গের দিনে। (সাম ৩৩: ১২-২২)

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক দেশের মানুষ যেন ইশ্বরের ওপর নির্ভর করে। কারণ ইশ্বরই তাদের লালনপালন ও রক্ষা করেন। ইশ্বরের শক্তিতেই তারা বিশদআপদ ও শত্রুদের কল থেকে রক্ষা পায়।

সাধু পিতর তাঁর প্রথম ধর্মপ্রবর্তন করেন, “তোমরা কিছু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় বাজক-সমাজ, এক পবিত্র জাতি, একান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি। তোমরা এখনোই মনোনীত, যাতে তোমাদের যিনি অশুকার থেকে তাঁর অশুদূষ আশাকে আহ্বান করেছেন, তাঁরই সমস্ত মহাকীর্তির কথা তোমরা যেন প্রচার করতে পার। এককালে কোনো জাতিই ছিলে না তোমরা, কিন্তু আজ হয়ে উঠেছে স্বয়ং পরমেশ্বরেরই জাতি; এককালে তাঁর কনুগার পাত্রও ছিলে না তোমরা কিন্তু আজ তোমরা, তাঁর কনুগা পেয়েই গেছ” (১পিত্র ২:৯-১০)।

সাধু পিতর আমাদের বলতে চান যে, আধ্যাত্মিকভাবে আমরা ঈশ্বরের আপন জাতি। যদি আমরা তাঁর প্রতি তত্ত্বি ও ভালোবাসা বজায় রাখি, যদি তাঁর সব নিয়মকানুন পালন করে চলি তবেই আমরা তাঁর আপন জাতি।

অনুশীলনী

সূচনাংশ পূরণ কর

১. তোমরা তোমাদের শত্রুদের _____।
২. যারা তোমাদের নির্বাসন করে, তাদের জন্য _____ প্রার্থনা কর।
৩. তোমরা একে অপরের প্রতি _____ হও।

বায় পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বায় পাশ	ডান পাশ
১. যারা মদ কান্ড করে	ক. কমা করে নাও
২. ক্রমশ সুফল	খ. তবে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই
৩. পরস্পরকে তোমরা	গ. তারা শাসকদেরও ভয় পায়
৪. যদি আমরা কমা করতে না-চাই	ঘ. অন্তরে শান্তি বিরাজ করে
৫. সহনশীলতা একটি অর্জনযোগ্য	ঙ. প্রতীকা করে থাকি
	চ. মানবিক গুণ

স্বনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ‘পিতা, তাদের কমা কর! ভরা যে কী করছে, ভরা তা আনে না’ –উক্তিটি কার?
 - ক. পিতরের
 - খ. স্ত্রীফানের
 - গ. যোহানের
 - ঘ. যীশুর
২. কীভাবে সহনশীল হওয়া যায়?
 - ক. ঈর্ষ ধরে
 - খ. কমা করে
 - গ. বিকেনা করে
 - ঘ. সেবা করে

নিচের উদ্দেশ্যটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রফ্রু বিদেশে থাকেন, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে গ্রামে। সবসময়ই তার চোখে ভেসে ওঠে গ্রামের সবুজ ফসলের মাঠ, নদীর পানি ও পাখির কলরব। আবার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করলেও চমকে ওঠে। তিনি বিদেশে পরিবেশ বিষয়ক ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তাই তিনি চিন্তা করেন গ্রামের পরিবেশকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। তিনি গ্রামে ফিরে আসলেন এবং এ বিষয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করলেন। গ্রামের লোকেরা এ কাজে অনুপ্রাণিত হলো।

৩. প্রফ্রুর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি স্টেট উঠেছে?

- ক. সহযোগিতা
- খ. দেশপ্রেম
- গ. সহনশীলতা
- ঘ. আত্মসংযম

৪. প্রবন্ধ এ কাজের কলে গেষ্টে পারে না –

- i. প্রশংসা
- ii. শাস্তি
- iii. ঐশশক্তি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

১. নিলয়, অয়ন ও ঐশী সহপাঠী। একইসঙ্গে স্কুলে যায় ও খেলাধুলা করে। তিনজনই খুব বিখ্যাসী কব্দু। একদিন ঐশীর কাছ থেকে অয়ন একটা বই ধার নিল। পরীক্ষার ঠিক আগের দিন ঐশী তার বইটা ফেরত চাইল। কিন্তু অয়ন কল, 'কোনো প্রমাণ নেই যে আমি তোমার বই নিয়েছি।' ঐশী তার কথা খুব আখ্যাত পেল। তার এই অস্বীকারের কথা ঐশী নিলয়কে জানাল। নিলয় রেষে গিয়ে অয়নকে মার দিল। অয়ন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বইটা নিয়ে এলো। ঐশীর সব কষ্ট ভ্রান হয়ে পেল। কিন্তু নিলয় কিছুতেই অয়নকে সহ্য করতে পারল না।

- ক. সহনশীলতা আমাদের কাজে কী আনে ?
- খ. ঈশ্বর কেন আমাদের গাপ কমা করেছেন ?
- গ. ঐশীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. নিলয়ের এ কাজের পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

২. সুজন ও মৈত্রী এক বাসে করে স্কুলে যাচ্ছিল। ছাইভার নিয়মমাসিক গাড়ি চালাচ্ছিল। স্কুলের গেট বন্ধ হয়ে বাবে এইজন্য খুব চিন্তা করছিল সুজন। সে বার বার ঘড়ি দেখছিল এক বিরক্ত হচ্ছিল ছাইভারের ওপর। চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। বাইরে কী হচ্ছে সেটা না বুঝে সুজন ও গাড়ির অন্যান্য লোকেরা খুব বকা দিচ্ছিল ছাইভারকে। সবাই মিলে খুব খারাপ কথা বলতে লাগল। পরিস্থিতি খারাপ বুঝে মৈত্রী বলে উঠল, 'সুজন কেন বকা দিচ্ছ ছাইভারকে। ওনারতো কোনো দোষ নেই। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যইতো তিনি বাস ধামিয়েছেন।' ধৈর্য ধরেন আপনারা, রাল করবেন না। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলকে নিয়ে যাকেন নিরাপদে।'

- ক. দেশপ্রেম কী ?
- খ. আমরা কেন শাসকদের অনুগত থাকব ?
- গ. মৈত্রীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মৈত্রীর মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের চর্চার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

সবিকল্প-উত্তর প্রশ্ন

- ১. দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় ?
- ২. নিজেদের প্রকাশ করার জন্য আমাদের মাঝে কী থাকতে হবে ?
- ৩. সহনশীলতা বলতে কী বোঝায় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

- ১. কমা করার কলাকল ব্যাখ্যা কর।
- ২. সহনশীলতা অর্জনের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
- ৩. দেশপ্রেম সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা কী ? বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি পবিত্র রুশ সংঘের একজন বাস্ক ছিলেন। বীশুর নামে জীবন উৎসর্গ করে মা-বাবা, তাইবোন, আত্মীয়স্বজন, আপন দেশ-সবকিছু ত্যাগ করে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) আগমন করেন। যাকবীয় সেবাকাজের প্রশাসাণি তিনি সমাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরকে আপন করে পেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়নের জনক এবং কারিতাস, প্রকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির সাথে গুণপ্রভভাবে জড়িত ছিলেন। এদেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি এদেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এদেশের মাটির কোলেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। আমরা এখানে ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানব এবং তাঁর জীবন ও কাজের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাব। এর প্রশাসাণি আমরা দরিদ্র ও অতাবী মানুষের সেবাকাজে উদ্বুদ্ধ হবো।



ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- ফাদার ইয়াং-এর শৈশব ও শিক্ষাজীবন বর্ণনা করতে পারব।
- স্থপদান সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দারিদ্র্য বিমোচনে ফাদার ইয়াং-এর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের প্রতি মমত্ববোধ দেখাব।

পাঠ ১: শৈশব ও শিক্ষাজীবন

ফাদার চার্লস বোসক ইয়াং ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ডানিয়েল ইয়াং ও মায়ের নাম মেরি জেনিসেন। তাঁদের উভয়েই পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল আয়ারল্যান্ডে। বহু আগে তাঁরা অধিকতর সুখের সন্ধানে আয়ারল্যান্ড ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। চার্লসদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে। আর মেরি জেনিসেনের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন এরও কিছুকাল পরে। ‘ইয়াং’ শব্দের অর্থ হচ্ছে তরুণ। কাজেই ইয়াংদের পরিবারের আদর্শবাণী হচ্ছে ‘সদা তরুণ’ বাবা অর্থাৎ সব সময় তরুণ থাকা। ফাদার ইয়াং তাঁর সারা জীবনের কথার ও কাজে তরুণ ছিলেন।

ফাদার ইয়াং-এর বাবা ডানিয়েল ছিলেন নিউইয়র্কের অর্বাণ শহরে একটি কারখানার কর্মী। এই কারখানায় কাজ পাবার পর তিনি মেরি জেনিসেন-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দুইজনে মিলে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের সপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরা দুইজনে মিলে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁদের ঘরে তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। চার্লস ছিলেন তাঁদের মধ্যে তৃতীয়। চার্লসের মা মেরি তাঁর চতুর্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন, সন্তানটিও মারা যায়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে চার্লসের বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। কারখানায় কাজ করা ও সন্তানদের লালনপালন— দুই কাজ একসাথে চালিয়ে যাওয়া ডানিয়েলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেকটা নিঃশ্রুতি হয়ে চার্লসের বাবা সন্তানদেরকে একটি অন্যতম অশ্রমে রাখেন। কিছুদিন পর তিনি যিটীবাবার বিয়ে করেন এবং সন্তানদের তার কাছে নিয়ে আসেন।

চার্লসের ষড়্‌ ভাই ফ্র্যাঙ্ক স্টেট বার্নার্ড সেমিনারিতে কাজ করতেন। দুই বছর কাজ করার পর পড়াশুনার উদ্দেশ্যে তিনি অন্যত্র চলে যান। ভাইয়ের ছেড়ে দেওয়া সেমিনারির কাজটি চার্লস সাদরে গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর কাজ ছিল হুট-ফরমাসেস, দারোয়ানগিরি এবং অন্যান্য ছোটখাট কাজকর্ম করা। প্রথম কিছুমুখ শেখ ইওয়ার সময়ও তিনি ওখানে ছিলেন।

প্রায়মারি স্কুলের গতি পার হয়ে চার্লস হাই স্কুলের পড়া শুরু করেন। তিনি নিউইয়র্কের সিরাকিউজে অবস্থিত দ্য মোস্ট হসি রোজারি হাই স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলটি পরিচালনা করতেন ইয়াকুস্টেট হার্ট অব মেরি সন্দেশের সিস্টারগণ। এই ধর্মশাস্ত্রের পালক পুরোহিত ফাদার মেহন ছিলেন খুবই দয়ালু। তিনি চার্লসকে পবিত্র হৃদয় সত্যে যোগ দিয়ে পূর্ববঙ্গে মিশনারি কাজে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

পাঠ ২: যাজকীয় জীবনের গঠন ও যাজকভিবেক

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, ২১ বছর বয়সে চার্লস পবিত্র হৃদয় সেমিনারিতে প্রবেশ করেন। তখন এই সেমিনারিটিকে ক্ষুদ্র সেমিনারি বলা হতো। এটি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। চার্লসের সব ক্লাস এই নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হতো। ফাদার ইয়াং আর্মি চ্যাপলেইন-এর কাজ করেছিলেন। এই কর্মদায়িত্ব নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রাণবন্ত সশস্ত্রবাহিনীর ন্যায় শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গঠনে প্রভাবিত করেছিল। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত স্টেট বোসক নভিসিয়েটে প্রবেশ করেন। প্রাধান্যশীল ও ঐশ্বর্যভর্য চার্লস তাঁর নভিসিয়েটে শেষ করে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর ব্রতসংখ্যা ছিল চারটি: দরিদ্রতা, কৌমার্য, বাধ্যতা এবং বিদেশে বাণী প্রচার।

চার্লস তাঁর শিক্ষা ও বাজকীর জীবনের পঠনকালে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিচালকদের বেশিরভাগই ছিলেন নামকরা ব্যক্তি এবং বিভিন্ন বিশেষ পুণে গুণায়িত। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফাদার টমাস ইরভিং। তিনি ছিলেন একজন অজ্ঞবিশারদ ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ।

সেমিনারির বিগত দিনগুলো চার্লসের জন্য কঠিন ছিল বটে কিন্তু সেগুলো খুব আনন্দের মধ্য দিয়েই কেটেছে। ফাদার চার্লস যে ইয়াং খেলাধুলা খুবই ভালোবাসতেন। শারীরিক উচ্চতা কিছুটা কম থাকায় তিনি ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলতেন না। হাই স্কুলের সুস্থ থেকে একেবারে বাজকীর অভ্যাসের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খেলোচেন টেনিস। খেলাধুলার তিনি ছিলেন যেমন সক্রিয় তেমনি কাজকর্মেও ছিলেন সমগরিমাণ সক্রিয়। একারণেই দেখে তিনি অফুরান শক্তি পেতেন এবং তাঁর দৈহিক পঠনও যথেষ্ট সঠিক ছিল। যারা তাঁকে আগে কখনো দেখেনি তারা সবসময় তাঁকে তাঁর সঠিক ব্যসের চাইতে অনেক কমবয়সী মনে করত। এভাবে যখনই কেউ তাঁকে বলত, তাঁর বয়স সঠিক ব্যসের চাইতে কম মনে হয় তখন তিনি বলতেন: “আমি তো সবসময়ই ইয়াং”।

চার্লস মিশনারি হয়ে বিদেশে যাবেন, এই চিন্তা সেমিনারি জীবনের প্রস্তুতিকালে সর্বদা তাঁর মন জুড়ে থাকত। তাই তিনি অনবরত চেষ্টা করতেন নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন ও নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করার। এভাবে তিনি সবজান্ডা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাগানে শাকসবুজ লাগানো থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, পাইপলাইন মেরামত থেকে শুরু করে দালানে ইট বসানো, মিস্ট্রিকাজ থেকে শুরু করে প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত সবকিছুই একটু একটু করে জানার চেষ্টা করেছেন। সেমিনার জীবনেও তিনি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং মাঝে মাঝে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত সেমিনারি অভিযুক্ত-বক্তব্য শুনতে গেলে ভীষণ আনন্দ উপভোগ করতেন। যেসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ পুরোহিত হিসেবে উপকারে আসবে এমনসব প্রোগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করতেন।

চার্লস ইয়াংকে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ফরেন মিশন সেমিনারিতে পাঠানো হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন একটি অসঙ্ঘব সন্মুখী বাস্তবায়িত হয়েছিল। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেদিন চার্লস ইয়াং তাঁর সতীর্থদের সাথে মিলে বাজকপদে অতিবিত্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি সিরিকিউজে ফিরে গিয়েছিলেন; সেখানে তিনি তাঁর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ধন্যবানের খ্রিষ্টবাসাটি উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে বাজক হয়ে ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং, সিএসসি এই বছরেরই অক্টোবর মাসে মিশনারি কাজের জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা সেওয়ার পূর্বে ফাদার ইয়াং তিন মাস সময় পেয়েছিলেন। ঐ সময়টুকু তিনি ব্যয় করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত মিশনারিদের জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে। অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখে তাঁরা কয়েকজন মিলে পূর্ববঙ্গের জন্য স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের দলে নটর ডেম কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল ফাদার জন হ্যারিটনও ছিলেন। তাঁদের দলটি নিউইয়র্ক থেকে সামুদ্রিক জাহাজে করে রওনা দেন। ইতালির নেপলস ও রোম এবং পরে কন্স ও কলকাতা হয়ে ঢাকার পৌঁছেন ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর।

পার্শ্ব ৩: সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং

ফাদার ইয়াং পৃথিবীর ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) মতো একটি দরিদ্র দেশে কাজ করতে এসেছেন। তিনি ময়মনসিংহে এলাকায় সীর্ঘদিন কাজ করেছেন। মানুষকে দরিদ্রতার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি বহু চিন্তাভাবনা করেছেন ও নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, সমবায় ঋণদান

সমিতির দ্বারা এই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। তিনি মানুষকে নগ্ন টাকায় নিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। এধরনের কাজ তিনি পছন্দ করতেন না। এর চাইতে বরং মানুষকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করা কেই সবচেয়ে উপকারি সাহায্য বলে গণ্য করতেন। তাঁর দু'টি বিশ্বাস ছিল: প্রভায়, শিব লক্ষ্য, কঠোর শ্রম-সাধনা এবং বলিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি থাকলে যে-কোনো মানুষের পক্ষে দরিদ্রতার অভিলাষ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই তিনি এবিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে কো-অপারেটিভ কাজে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিজের মধ্যে দু'টি প্রত্যয় জন্ম নেওয়ার পর তিনি আর্চবিশপ লরেন্স হেনার সিএসসি-র কাছে গেলেন। তাঁকে তিনি বোঝালেন যে, এতদিন তাঁরা ধর্মপন্থীতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে জনগণকে সংগঠিত করার কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন, দলীয়ভাবে জনগণের মধ্যে গতিশীলতা আনতে হবে, তাদেরকে সংযোজ্য করতে হবে। এভাবে কর্মতানু সমাজের পুঙ্খবহুতর সমস্যাগুলির আর্ক থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্য দরকার বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা।

এই লক্ষ্যে ফাদার ইয়ং-এর বিশুদ্ধ উৎসাহ দেখে আর্চবিশপ লরেন্স হেনার ফাদার ইয়ংকে কানাডার অবস্থিত নোভা স্কটিয়া-র এ্যান্টিগোনি-এ সমঝার ঋণদান সমিতির ওপর গড়াশূনা করার জন্য পাঠালেন। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪- এই দুই বছর গড়াশূনা শেষ করে তিনি দেশে ফিরলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) সমঝার ঋণদান সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন।

সমঝার ঋণদান সমিতি

সমঝার ঋণদান সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে সল্ট একটি ধারণা থাকা দরকার। ক্রেডিট ইউনিয়নকে বলা যেতে পারে সহস্রদত্ত বা পরস্পরস্বাক্ষরতার সাথে টাকা জমা করা ও নিম্নতম পরিমাণ সুদের বিধিমতে ঋণ প্রদান করার একটা প্রক্রিয়া। আবার এটাকে বিবেকশীল সুখোয়ার মহাজনদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলা যেতে পারে। কেউ কেউ আবার এটাকে কলতে পারে একটি অধিকতর ভালো ও পরিপক্বতর সমাজজীবনের চিহ্ন। ফাদার ইয়ং-এর মতে, ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে আদি শ্রীমন্ডলীর তত্ত্বদের মনোভাব অনুসারে অধিকতর কল্যাণকর ও অধিকতর সম্পদশালী সমাজজীবন গঠনের চিন্তিস্থল। তিনি কলতেন, সমাজ গঠন করার অর্থ স্থানীয় মন্ডলী গড়ে তোলা। এটি স্থানীয় মন্ডলীকে বিদেশি সাহায্যতার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করবে ও ধর্মপন্থীগণকে পরিত্যাগের ব্যর্থতার বহনে আত্মনির্ভরশীল করে তুলবে।

প্রথম ব্রিটান ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্ম

কানাডায় প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ফিরে এসে ফাদার ইয়ং আর্চবিশপ হাউসে থাকতে শুরু করেন। এখান থেকে তিনি এক মিশন থেকে অন্য মিশনে যাওয়াতে করে ভক্ত জনগণ ও যাজকদের প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। এর মধ্যে দেশে আবার নানারকম দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, বন্যা, ব্রা, ঝড়বাসল ইত্যাদি একটার পর একটা পেপেই রইলো। এত কিছুই পরেও ফাদার ইয়ং নিরুৎসাহিত হননি। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলল। নেতৃত্ববৃন্দের সাথে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সফলতাই তাঁদের প্রয়োজন এবং পরের কাছে হাত না-বাড়িয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পরে পুরান ঢাকার লক্ষীবাগারে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হলো প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়ন। কর্ণাট ম্যাককার্টি ছিলেন এর প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন যোনাস রোজারিও। সমঝার ঋণদান সমিতির নাম দেওয়া হয় ব্রিটান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। মন্ত্রবাণী হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করলেন ফাদার ইয়ং-এর একটি কথা: “দয়ার কাজের জন্য নয়, লাভের জন্যও নয়, বরং সেবার জন্য।”



ফাদার ইয়াং ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে শিখা দিচ্ছেন

ক্রেডিট ইউনিয়নকে তারা রেজিস্ট্রিকৃত করেন। রেজিস্ট্রি নম্বর ছিল ৪২। সুদূতে সদস্যসংখ্যা ছিল ৬০ জন এবং বছরের শেষেতে গিয়ে এর সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১১০। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছিল:

- ক) সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতার মনোভাব জন্মান;
- খ) সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনশীল ও দূরদর্শী (প্রভিডেন্ট) উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়ার জন্য তহবিল গঠন;
- গ) সদস্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল ও পারস্পরিক উপকার সাধনের মনোভাব বপন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

প্রথম ক্রেডিট ইউনিয়নটি খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এর সদস্যসংখ্যা ছিল ২৩৭ জন। ইউনিয়নের সশম বার্ষিকীতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭৬ জনে। শহরের বেশিরভাগ জনগণেরই মূল বাসস্থান কোনো না কোনো গ্রামে। ছুটিতে তারা গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন ও এর কৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করতেন। এর ফলে প্রতিটি মিশনেই ক্রেডিট ইউনিয়ন হ্রতবেগে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

নিবন তি' রোজারিও সমরায় স্বকর-এর তৃতীয় সংখ্যায় লিখেছিলেন যে, কেরানি, গৃহিণী, বাবুর্চি, নার্স ও শিক্ষার্থী ক্রেডিট ইউনিয়ন কো-অপারেটিভে যোগ দিয়ে অনেকভাবে উপকৃত হচ্ছে। তারা এর স্বাধায পরিচালনার ওপর বিশ্বাস ও আশ্বাস পিকড় পাড়তে সক্ষম হয়েছে।

ফাদার ইয়াং-এর দূরদর্শী চিন্তার আরেকটি ফলস্বরূপ হলো 'দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ।' এটাকে সচক্ষে কলা হয় কলুব। এটি ক্রেডিট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং এর গঠনকাল হলো ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি। বর্তমানে এর কর্মসূচিগি সারা বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের মাঝে।

পার্শ্ব ৪: দারিদ্র্য দূরীকরণে ফাদার ইয়াং-এর ভূমিকা

ফাদার ইয়াং এদেশের মাটি ও মানুষকে তীব্র ভালোবেসে ফেললেন। এদেশের দরিদ্র মানুষের কান্না ফাদার ইয়াং-এর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ দরিদ্র ও কষ্টভোগী মানুষের মাঝেই তিনি খ্রিষ্টকে দেখতেন। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই খ্রিষ্টকে সেবা করার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি। তাই মানুষকে স্বীভাবে দরিদ্রতার অভিমান থেকে মুক্ত

করা যায় তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন। তবে তিনি খুবই নীতিবান মানুষ ছিলেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ভিক্ষা দিয়ে মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। মানুষকে নিজ পায়ে পিঁড়ানের জন্য সাহায্য করার মধ্য দিয়েই তাদের প্রকৃত সাহায্য করা হয়। তাই তিনি এদেশের মানুষের দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

(ক) ধর্মপন্থী পন্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টা: ফাদার চার্লস বোসকে ইয়াং বর্তমান ময়মনসিংহে ধর্মপ্রদেশের বাইরাঙ্গা (মরিরমনগর), বিড়িভাঙ্গুনি, বারমারী, রাণীবাং ইত্যাদি অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি সেখানে মানুষকে সংগঠিত ও উদ্ধৃত করেছিলেন। এসব অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের জন্য ধানব্যাংকে পরিচালনা করেছেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এসব অঞ্চলের অসহায় মানুষদের ওপর হয়রানি, নির্যাতন ও গুটপাট চালানো হয়েছিল। তিনি সেগুলোর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অসীম সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি দরিদ্র মানুষকে নিজ নিজ বাসস্থানে শান্তিতে বসবাস করতে সহযোগিতা করেছেন। তিনি তাদের অভাব মোকাবেলা করার জন্য কৃষিক্ষেত্রী মানুষকে ফসলের বীজ, গৃহপাণিত পশু ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। এভাবে তিনি অতাবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে উচ্ছল দৃষ্টিতে রেখেছেন।

(খ) কারিতাস প্রতিষ্ঠা: বর্তমান কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে ফাদার ইয়াং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কারিতাস শুরুর করেছিলেন। এই কারিতাস ছিল রোমের আন্তর্জাতিক কারিতাসের অধীনে। ফাদার ইয়াং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মপন্থীতে কারিতাসের যাত্রা বিস্তৃত করছিলেন। এ-সময়ের কারিতাস ধর্মপন্থী পন্থায় সীমিত আকারে মাত্র গুটিকয়েক প্রকল্প পরিচালনা করত। গ্রাম থেকে কিছু আর্থিক মজুরি দেওয়া হতো। রোমের আর্থিক সাহায্যের আশায় না থেকে ধর্মপন্থীর স্থানীয় জনগণকেও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে অনুপ্রাণিত করা হতো। এই তহবিলের অর্থ প্রধানত ব্যবহার করা হতো কণ্টকর বা দুর্যোগমূলক পরিস্থিতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

(গ) কের প্রতিষ্ঠার ফাদার ইয়াং-এর অবদান: ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘটেছিল এক প্রায়বৈধী জলোচ্ছ্বাস। এর ফলে অগণিত মানুষ মারা গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ স্বজনহারা, গৃহহারা ও ফসলহারা হয়েছিল। বহু বছর পর এই সময় ফাদার ইয়াং ছুটি কাটাতে নিজ সেপে গিয়েছিলেন। এক মাস ছুটি কাটাতে না কাটাতেই বিশপ পাভুলি তাঁকে এক জ্বরির ভারবর্তা পাঠিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সর্বোদর দিলেন ও অতি সড়ুর ফিরে এসে ত্রাণকার্যে বোপ দিতে বললেন। তিনি অনতিবিলম্বে ফিরে আসেন। এসেই অসহায় মানুষের সাহায্যে নিবেদিত হয়ে পড়েন। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ যোয়াকিম রোজারিও, সিএসসি ও ফাদার কেজামিন লাবে, সিএসসি-র সাথে একাত্ম হয়ে তিনি 'কের' নামক ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা স্থাপন করেন ও ত্রাণকাজ শুরুর করেন। এই ক্ষতির বেশ শেষ না-হতেই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে শুরুর হয় মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত লাখ লাখ মানুষের কল্যাণে ও পূর্ণপটন কাজে ফাদার ইয়াং কোরের পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীদের সাথে এক হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। এই কের পরে কারিতাস বাংলাদেশ নাম নিয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশের অনাচে-কানাচে দীনদরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

(ঘ) এনএফপি প্রতিষ্ঠার ফাদার ইয়াং: কর্মপাল কিস্কণ পরিকল্পনাকারী ফাদার ইয়াং বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন। তিনি প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার মধ্য গিয়ে জনসংখ্যাকে কাক্ষিত পন্থায় আনার লক্ষ্যে কাজ শুরুর করেন। পুরো কাছটি সূচাবলুপে সমল্লু করতে ফাদার ইয়াংকে সহযোগিতা করেছেন সিস্টার ইমেল্ডা এসএমআরএ। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এনএফপির যাত্রা শুরুর হয়। বর্তমানে কারিতাস এটি বাংলাদেশ-এর একটি প্রকল্প। কমিউনিটি হেলথ এ্যডা ন্যাচারাল 'ফ্যামিলি প্র্যানিং' দেশের মানুষের উপকারে কাজ করছে। পরিকল্পিত পরিবার গঠন করে মানুষ তর দরিদ্রতা দূর করবে-সর্বশেষ ফাদার ইয়াং এই সঙ্গুই দেখেছিলেন।

পাঠ ৫: ফাদার চার্লস ইয়াং আজও জীবন্ত

ফাদার চার্লস বোসক ইয়াং ইহলোক ত্যাগ করেছেন ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। ইতোমধ্যে তাঁকে ভুলে যাওয়ার মতো অনেক বছর পার হয়েছে। কিন্তু তাঁকে মানুষ মোটেও ভুলে যায়নি। বরং তাঁকে দিনে দিনে মানুষ যেন আরও বেশি করে স্মরণ করছে। তাঁর নামে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম নিচ্ছে। কারিতাস, ক্রেডিট ইউনিয়ন আপোলন, প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা- এসব শুধু টিকেই থাকছে না, অপণিত মানুষের জীবনে এগুলো ভীষণভাবে প্রভাব ফিটার করে চলছে। ফাদারের নামের অর্থাৎ যেমন চিরতরুণ (ইয়াং), তেমনি তাঁর জীবনের কর্মশৃঙ্খলও চিরতরুণ রয়ে গেছে। এই কর্ম দ্বারা গতিতে এগিয়ে চলছে এক পৌছে যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন

ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন হলো তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক পুরুষপূর্ণ মৃতিরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি ‘ফাদার ইয়াং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন’ নামে শুরু হয় এবং ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এটির নাম পরিবর্তন করে ‘ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন’ রাখা হয়। এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ক্রেডিট ইউনিয়নের ধারণাটি সমাজের দরিদ্রতম ও অবহেলিত বিভিন্ন দলের কাছে বিস্তার করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা;
- ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রত্নিতগত সহায়তা প্রদান করা;
- ক্রেডিট ইউনিয়ন আপোলনে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে সহায়তা করা; এবং
- শ্রেষ্ঠ ক্রেডিট ইউনিয়ন, শ্রেষ্ঠ কো-অপারেটর ও শ্রেষ্ঠ কর্মীদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা ও প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করা।

অন্তরও পদক্ষেপ নেওয়া হয় যে,

- বাংলাদেশের সকল ক্রেডিট ইউনিয়ন ফাদার ইয়াংকে ক্রেডিট ইউনিয়ন আপোলনের প্রবর্তক বলে ঘোষণা করবে।
- তেজগাঁ কবরস্থানে ফাদার ইয়াং-এর কবরটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সজ্জক করা হবে।
- দেশে ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোকে তাদের কার্যালয় বা হলঘরের নাম ফাদার ইয়াং-এর নামানুসারে রাখার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট বার্নার্ড এল. ম্যাককর্কর্নি শিবেহিলেন:

যে পনের জন ‘কৃপিক’ ক্রেডিট ইউনিয়নের তিভিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাটি কাটার জন্য ডেকে একত্রিত করা হয়েছিল, আমাকে তাদের সর্গারের ভূমিকা পালন করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বলে আজ খুবই তৃপ্তি অনুভব করছি। সেই বিময়ক মানুষটি অর্থাৎ শ্রুত্থেয় ফাদার চার্লস ইয়াং, সিএসসি আমাদের হৃদয়-কেন্দ্রের মাটিতে যে ধারণার বীজ বপন করেছিলেন সেটার থেকে একটা ইউনিয়ন গড়ে তোলা আমাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জপূর্ণ ছিল। তিভিপ্রস্তরের জন্য গর্ত খনন করাও সহজ কাজ ছিল না। তথাপি আমাদের জনগণের মধ্যে গভীর বিশ্বাস ও সেবার পর সেবা, এরপর আরও সেবা-এভাবে আমরা সুবহৎ অট্টালিকাটির মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য মজবুত চরণগুলো দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা, প্রবর্তকরা, আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে শ্রুত্থার্থ নিবেদন করছি কারণ আপনারা ক্রেডিট ইউনিয়নকে জীবিত রাখার ও ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠার কাজটি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁখে তুলে নিয়েছেন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ইয়াতদের পরিবারের আদর্শবাণী হচ্ছে _____।
২. ইয়াং _____ খুব ভালোবাসতেন।
৩. _____ গঠন করার অর্থ স্থানীয় মডেলী গঠন কর।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষে	■ খেলাধুলা খুব ভালোবাসতেন
২. ফাদার চার্লস ইয়াং	■ তিনি ব্রিটকে দেখতেন
৩. সমাজ গঠন করার অর্থ	■ সেন্ট যোসেফ লিভিংহেট প্রবেশ করেন
৪. দরিদ্র ও কটভোগী মানুষের মাঝেই	■ তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল
৫. পরিকল্পিত পরিবার গঠনে	■ স্থানীয় মডেলী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফাদার ইয়াং তাঁর সারা জীবনে কাছে কেমন ছিলেন ?

- ক. বিনয়ী
- খ. উদ্বেগ
- গ. তরুণ
- ঘ. অনুপ্রাণিত

২. ফাদার ইয়াং-এর মতে সমাজ গঠন করার অর্থ ?

- ক. স্থানীয় সমাজ গড়ে তোলা
- খ. স্থানীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলা
- গ. স্থানীয় মন্ডলী গড়ে তোলা
- ঘ. স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাজত গণিতে দুর্বল। তার শ্রেণিতে অন্যের খাতা দেখে দেখার অভ্যাস। তার বন্ধু সমির এই অবস্থা দেখে রাজতকে একদিন ডেকে গণিতের নিয়ম বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। এরপর থেকে রাজতকে যে কোনো অঙ্ক দেওয়া হয়, তাই তার কাছে সহজ মনে হয়। গণিতের প্রতি তীতি দূর হয়।

৩. সমিরের কাছে ইয়াং-এর যে গুণটি প্রকাশ পায় তা হলো —

- i. অজ্ঞতা দূর করা
- ii. সহযোগিতা করা
- iii. প্রকৃতই সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. সমিরের উক্ত কাজে রাজত হয়ে উঠতে পারে —

- ক. আত্মনির্ভরশীল
- খ. সাহসী
- গ. সবেমী
- ঘ. বুদ্ধিদীপ্ত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কলিল পরিবারের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। গত বছর টর্নেডোর পর কলিল কাপড়, খাবার, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে দুর্গম এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাঁর উপস্থিতি অসহায় মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার আশা বোগায়। কলিল ঐ গ্রামের শিক্ষার উন্নয়নেও এগিয়ে আসেন। তিনি ভেঙে যাওয়া স্কুল-কলেজগুলো মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন।

ক. চার্চসের বড় তাই কোথায় কাজ করতেন ?

খ. ফাদার ইয়াং সারা জীবনই ভ্রমণ—এ কাজটির মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. ফাদার ইয়াং-এর কোন সংস্থার কার্যক্রমের দ্বারা কলিল অনুপ্রাণিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাদার ইয়াং ও কলিলের কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. পাহাড়তলিতে অনিমা খুব ধর্মভীরু ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন স্ত্রী, যিনি মানুষকে মিতব্যয়ী হতে ও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেন। তিনি ঐ এলাকায় বিভিন্ন মানুষের আয়ের অতিরিক্ত টাকা তাঁর কাছে জমা রেখে একটি সমিতি গঠন করেন, যেখান থেকে তাদের সদস্যদের প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করেন। ফলে অনেক লোক তাদের প্রয়োজনের সময় আর্থিক সাহায্য পেয়ে লাভবান হয়।

ক. কালব কোন সংস্থার সঞ্চিৎ রূপ ?

খ. কারিতাস বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের কাজ করে ?

গ. ফাদার ইয়াং-এর কোন কাজের শিক্ষা অনিমাতে অনুপ্রাণিত করেছিল ?

ঘ. ‘অনিমার কাজ ঐ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে’— তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইয়াং শব্দের অর্থ কী ?
২. চার্লস শিশুকালে কোথায় ছিলেন ?
৩. চার্লস তার নতিশিষ্টেট কবে শেষ করেন ?
৪. তিনি কয়টি ব্রত নিয়েছিলেন ? সেগুলো কী কী ?
৫. কোথায় চার্লস ইয়াং বাজক পসে অভিমুখ হয়েছিলেন ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় ফাদার ইয়াং-এর অবদান আলোচনা কর ।
২. কোন বিষয়টি সামনে রেখে ফাদার ইয়াং খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপন করেন ?
৩. ফাদার ইয়াং দারিদ্র্য দূরীকরণে কেমন ভূমিকা পালন করেছেন ?

সমাপ্ত